বার্ষিক গ্রাহক নবীকরণ

সংবাদমন্থনের বার্ষিক গ্রাহকদের অনুরোধ, নবীকরণের জন্য ৪০ টাকা চাঁদা ডাকযোগে নিচের ঠিকানায় পাঠান:

জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর,
পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮

খবরের কাগজ

সংবাদমন্থন

Vol 4 Issue 9 1 November 2012 Rs. 2 http://www.songbadmanthan.com

চতুর্থ বর্ষ নবম সংখ্যা ১ নভেম্বর ২০১২ বৃহস্পতিবার ২ টাকা

• বড়ো মিডিয়া পৃ ২ • সিম লক পৃ ২ • ফৈজাবাদ পৃ ২ • পাথর খাদান পৃ ৩ • শারদ সংখ্যা পৃ ৩ • অযোধ্যা পৃ ৪ • টাকী ভ্রমণ পৃ ৪ • স্যান্ডি পৃ ৪

পুজো সবার মুখে হাসি ফোটায় না

পুজোর আগে এবং পুজোর সময় পুজোর বিজ্ঞাপন এমন উচ্চগ্রামে হতে থাকে যেন সবার জন্য পুজোর আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। বস্তুত তা কিন্তু নয়। সেটাই বুঝতে পারলাম ষষ্ঠীর দিন কোচবিহারে ঘুরতে গিয়ে। স্থানীয় এসি ডিসি ক্লাবে গিয়ে দেখছি আগত দর্শনার্থীদের দিয়ে কিছু গরিব দুস্থ মহিলাদের কাপড় বিতরণ করা হচ্ছে পুজো প্যান্ডেলের পেছন দিক দিয়ে। আলোহীন আবছায়ায়। কাপড় পাচ্ছিল শুধু তারাই, যাদের স্লিপ ছিল। বেশিরভাগ বৃদ্ধারই স্লিপ ছিল না। একটা কাপড়ের জন্য আশি ঊর্ধ্ব অনেক কুঁজো হয়ে থাকা মহিলা আমাদের বলছিলেন পুজো কমিটিকে বলার জন্য, যেন তাঁরা কাপড় পান। পুজো যে বেশিরভাগ মানুষের জীবনে দুঃখের, দারিদ্র্যের ফারাককে আরও উঁচুতে নিয়ে যায়, সেটা আমরা না দেখতে পাওয়ার অভ্যাস করে ফেলেছি। সেই অভ্যেস ছাপিয়ে সত্যকে দেখলাম সেদিনের বস্ত্র বিতরণে। ছবি ও খবর রামজীবন ভৌমিক, কোচবিহার, ২৭ অক্টোবর।

ভাসান

শান্তনু ভট্টাচার্য, মেটিয়াবুরুজ, ৩০ অক্টোবর •

আটশো থেকে সাতশো, ছশো হয়ে শেষ পর্যন্ত পাঁচশোয় রফা। পাঁচশোতেই ওরা রাজি। রাজি না হয়ে বোধহয় উপায়ও ছিল না। আর পার্টি নেই। এটাকে নামিয়ে দিতে পারলে আজকের দিনটা শেষ। শুধু যে ওরাই মথুরাপুর বা ক্যানিং থেকে এসেছে, তা তো নয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যত্র থেকেও এসেছে অনেকে। একটু ঝুঁকি ও সাহস মূলধন করে দুদিনে বেশ কিছু পয়সা হাতে আসে। ছোটো ছোটো দলগুলোর মধ্যে তাই থাকে নীরব প্রতিযোগিতা। বঙ্কিমচন্দ্রের মূর্তি মাঝখানে রেখে ওপাশে বাবুঘাট, এপাশে গোয়ালিয়র ঘাট। আমরা গোয়ালিয়র ঘাটে। লরি, ম্যাটাডোর, ট্রেলারের ওপর সারি দিয়ে শৈল্পিক দুর্গাপ্রতিমা। ঘড়িতে রাত দেড়টা। মধ্যরাতের প্রাত্যহিক নিস্তব্ধতার বদলে আজ এখানে উৎসবের আলোকিত উল্লাস। রোল, চাউমিন, ভুট্টা, চা, ঝালমুড়ির ছড়ানো ছেটানো পসরা। খাঁকি-সাদা পুলিশি তীক্ষ্ণ নজরদারি। জলে সতর্ক জলপুলিশ, লাইফবোটের প্রহরা। জলে পড়ছে ফুল-বেলপাতা আর বাঁশের রুক্ষ কাঠামো। জলখাওয়া এই কাঠামোটি বড়ো মূল্যবান। জীবনের চাইতেও। তাই ওরা সন্ধ্যের পর থেকে জলেই থাকে। বয়স চোদ্দো, পনেরো কিংবা ষোলো।

হই হই করে কুড়ি-বাইশ জনে দড়ি বেঁধে লরি থেকে প্রতিমা নামালো। এরা চব্বিশ-পঁচিশ-ছাব্বিশ। তারপর বাঁশের দুটি মোটা কঞ্চির ওপর বসিয়ে তা এগিয়ে নিয়ে চলল। মাঝখানে রেললাইন। আবার ওরা গলায় রব তুলল এবং হাতের ওপর প্রতিমা। রেললাইন ডিঙিয়ে ঘাটের কাছে, তারপর মাটি মাখামাখি পিচ্ছিল সিঁড়ি বেয়ে জলের প্রান্তে। ওপর থেকে দড়ি ধরে দুজন। জলে নামিয়ে দিল মৃন্ময়ী মূর্তিকে। ঝপাং স্বরে কেঁপে উঠল নদী।

কী নিখুঁত পদ্ধতি! আমরা দেখলাম। নিরাপদ দূরত্ব থেকে। পুলিশও দাঁড়িয়ে, নিরাপদ দূরত্বে। এক অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলাম কোথা থেকে আসে এই মুটেরা। অফিসার বললেন, মথুরাপুর-ক্যানিং; দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে।

জিজ্ঞাসা করলাম, সরকারকে এরা কোনো টাকা দেয়? অফিসার বললেন, তেমন কিছু না। থানায় এসে নাম ঠিকানা জমা দেয়। তারপর কাজে নেমে পড়ে। মতামত জানালাম আমি, ভালোই তো রোজগার হয়। অফিসার হাসলেন, দুটো দিনের তো ব্যাপার। ঝুঁকি কি কম! কারুর মাথা ফাটছে, হাত ভাঙছে, পা মচকে যাচ্ছে। আমি হিসাব কষলাম, আমরা পাঁচশো দিলাম। আঠারো, কুড়ি বা বাইশ দিয়ে পাঁচশোকে ভাগ, তাহলে এক-একজনের হাতে ...

চারপাশটা ফাঁকা হয়ে এসেছে বেশ কিছুটা। পুলিশের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে আজকের মতো এখানে তাদের কর্তব্য সারা হয়ে গেছে। আমরাও ফিরছি। আমি গাড়ির ভিতরে, গাড়ির পিঠে আমার পাড়ার ভাইরা-দাদারা। ক্যানিং-মথুরাপুর থেকে আসা ওরাও হয়তো জল থেকে উঠে হাত পায়ের কাদা ধুয়ে নিচ্ছে। ওরাও কারুর ভাই, কারুর দাদা। আমাদের গাড়ি দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে উঠে পড়ছে দ্রুত। নিচে চলে যাচ্ছে আমাদের শহর। কলকাতা। শহরটার দিকে আমরা সবাই তাকিয়ে থাকি। যে শহরটাকে একদিন গ্রাম দিয়ে ঘিরে ফেলার স্বপ্ন দেখেছিল কেউ কেউ! হিসাবের রোগটা আবার আমার মাথায় ফিরে এল। পাঁচশোকে আঠারো, কুড়ি বা বাইশ দিয়ে ভাগ করলে মাথাপিছু ...।

ফলতা সেজ-এ কোহিনুরে লক-আউট

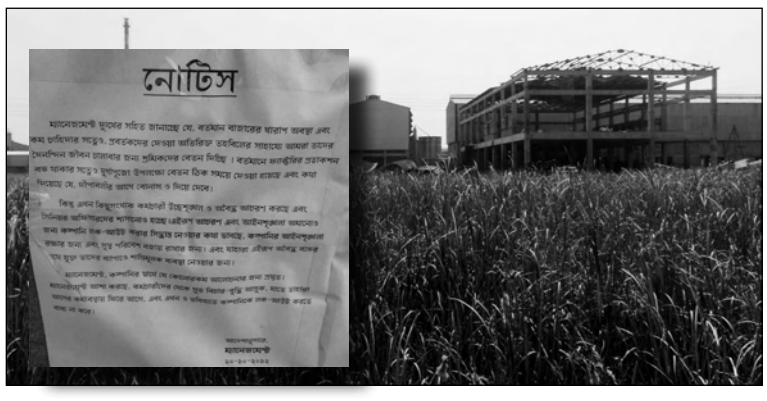

সপ্তমীর সকালে কোহিনুর পেপার মিলে লক আউটের নোটিশ ঝোলাল ম্যানেজমেন্ট। সংবাদমন্থনের ছবি, ২১ অক্টোবর। এ বিষয়ে আপডেটের জন্য সংবাদমন্থন ওয়েবসাইটে চোখ রাখুন।

দিনেদুপুরে জলাশয় হত্যা

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ২৫ অক্টোবর, জগাছা, হাওড়া •

হাওড়া শহরাঞ্চলের ব্যস্ততম রামরাজাতলা রেলস্টেশন থেকে মিনিট চার-পাঁচ হাঁটাপথে পড়ে ষষ্ঠীতলা-মণ্ডলপাড়ার সংযোগস্থল। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের পাশেই ওই মোড়ে রয়েছে গুণধর সামন্তের বিখ্যাত মিষ্টির দোকান। তার প্রায় গা ঘেঁষে রয়েছে মহাবীর অ্যাপার্টমেন্ট। সামনেই রয়েছে বহু পুরোনো ২০ কাঠার একটি জলাশয়। ঘন বসতিপূর্ণ এলাকাটি হাওড়া পৌরসভার ৪৮নং ওয়ার্ডের জগাছা থানার মধ্যে পড়ে। এখানে রয়েছে ছোটো ছোটো কারখানা, তিন-চারটি বহুতল আবাস। মাঝে এই জলাশয়টি ছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের নিত্যপ্রয়োজনে ব্যবহৃত একটি নির্ভরযোগ্য পুকুর। এর বাঁধানো ঘাট বহন করে চলেছে অসংখ্য মানুষের পদচিহ্ন। জলাশয়ে খেলা করত মাছের দল।

২০১১ সালের ৩০-৩১ আগস্ট তৎকালীন বাম জমানার ষষ্ঠীতলা, ধর্মতলা, খাঁয়েরবাগান এলাকার অসংখ্য পুকুর ভরাটের নায়ক রঞ্জিত পাল ওরফে মেজকা দলবল নিয়ে হাজির হয় ওখানে। দু-তিনদিনের মধ্যে বাঁশ পুঁতে ওই জলাশয়টিকে নতুন টিন দিয়ে ঘিরে ফেলে। এর সাবেক দাগ নং হল ১৪২৩, মৌজা সাঁতরাগাছি, জে এল নং ৪।

'সামাজিক' সন্ত্রাসের ভয়ে যখন সাধারণ মানুষ ইষৎ প্রতিবাদ করে চুপ করেই রইল, তখন শিবপুরের 'পরিবেশপ্রেমী নাগরিকবৃন্দ' ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ একটি লিখিত অভিযোগ করল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তার প্রতিলিপি পাঠানো হল পরিবেশমন্ত্রী সুদর্শন ঘোষ দস্তিদার সহ হাওড়ার মেয়র, পুলিশ কমিশনার, মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক, শিবপুরের বিধায়ক, ৪৮ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা, জগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে।

অভিযোগপত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশমন্ত্রী সুদর্শনবাবু তৎপরতার সাথে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আইনশৃঙ্খলা বিভাগের আইজি-কে একটি নির্দেশ জারি করেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসন সরেজমিন তদন্ত করে পুকুরটির চারপাশে লাগানো টিনগুলো খুলে দেয়।

কিন্তু মেজকার হুমকিতে কেউ আর পুকুরের ধারে যায় না। যেসব জেলেরা ওই জলাশয়ে মাছ চাষ করত, তারাও সব বেপাত্তা হয়ে যায়। ফলে অব্যবহৃত জলাশয়টি হয়ে ওঠে কচুরি পানার খেত। পাশের ছোট্ট বস্তির কয়েকজন কচুরি পানা সাফ করতে গেলে তাদের বলা হয় — 'এটা কি তোদের বাপের পুকুর?' সঙ্গে জোটে কিছু চড়-থাপ্পড়। ফলে পুকুরটির বাঁধানো স্নানের ঘাট এখন সর্বত্র ঝোপঝাড় আগাছায় পরিপূর্ণ।

প্রাক্তন ডিএসপি গোপাল মশাটের জামাই উজ্জ্বল হত্যা সহ অসংখ্য খুনের জন্য অভিযুক্ত মেজকা সর্বত্র তদ্বির করছে, 'পুকুরটা কেউ ব্যবহার করছে না, দূষণ ছড়াচ্ছে। আমাকে ভরাট করতে দেওয়া হোক।'

পুকুরটাকে সংরক্ষণ করার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে আর একটি ভয়ঙ্কর চাঞ্চল্যকর তথ্য আমাদের সামনে উঠে আসে।

আদালতে জীবন্ত জলাশয় হয়ে যায় ঘর সহ বাস্তু

২০১১ সালের ১৮ আগস্ট। স্থান : হাওড়া জেলা রেজিস্ট্রি অফিস। সেখানে এই টলটলে জল ভর্তি জীবন্ত জলাশয়কে (৩৩ শতক) কাগজে কলমে চার টুকরো করা হয়। প্রতি টুকরোয় ১০০ বর্গ ফুট

(ওপরে) প্রথমে যখন জলাশয়টিকে টিন দিয়ে ঘেরা হয়েছিল। (নিচে) পরে যখন পরিত্যক্ত জলাশয় কচুরিপানায় ভরে গেল।

টালির ঘর এবং কমন প্যাসেজ সহ চারটি প্লটকে রেজিস্ট্রি করা হয়। শুধু তাই নয় অস্তিত্ববিহীন কল্পিত প্লটগুলির ডিড প্ল্যানগুলি হাওড়া পৌরসভার প্রতিনিধির কাছ থেকে 'তারিখবিহীন' স্বাক্ষরে সিলমোহর সহ মঞ্জুর করা হয়েছে।

অস্তিত্ববিহীন কল্পিত প্লটগুলির ক্রেতাগণ

১। রঞ্জিত পাল, পিতা (প্রয়াত) জয়দেব পাল, কামারডাঙ্গা, শীতলাতলা, হাওড়া।

২। দেবব্রত পাত্র, পিতা (প্রয়াত) লালমোহন পাত্র, পল্লবপুকুর, কালীতলা, হাওড়া।

৩। রবীন দাস, পিতা (প্রয়াত) সহদেব দাস, খাঁয়েরবাগান, সাঁতরাগাছি, হাওড়া।

৪। প্রসেনজিত খাঁ, পিতা (প্রয়াত) বিনয়ভূষণ খাঁ, বালিটিকুরী, শেঠপাড়া, হাওড়া।

অস্তিত্ববিহীন কল্পিত প্লটগুলির বিক্রেতাগণ

১। সূর্য শেঠ, পিতা (প্রয়াত) অমরেন্দ্রনাথ শেঠ, ষষ্ঠীতলা, সাঁতরাগাছি, হাওড়া।

১। শুকদেব শেঠ, পিতা (প্রয়াত) অমরেন্দ্রনাথ শেঠ, ষষ্ঠীতলা, সাঁতরাগাছি, হাওড়া।

আদালতে মিথ্যা তথ্য দিয়ে একটি এক বিঘা জলাশয়কে হত্যা করে চারটি প্লটে ঘর সহ বাস্তু হিসেবে দেখিয়ে রেজিস্ট্রি করা হয়েছে রাজ্যের ভূমি আইন, পৌর আইন ১৯৯৩, পুকুরে মৎস্য চাষ সংশোধিত আইন ১৯৯৩ সহ যাবতীয় আইনি ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে। যারা এই কাজে লিপ্ত, তাদের ওপর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

দাবি পূরণ হলে তবেই পুরস্কার নেবেন শর্মিলা

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ২৫ অক্টোবর •

'ইরম-এর দাবি পূরণ হলেই তিনি নিজে হাতে আপনাদের থেকে এই পুরস্কার নিয়ে যাবেন, ততদিন এই পুরস্কার আপনাদের কাছে গচ্ছিত থাক' — কথাগুলো বললেন ইরম শর্মিলার বড়ো ভাই ইরম সিংহজিৎ। কেরালার লেখক-শিল্পীদের নিয়ে সংগঠিত কেভলান ট্রাস্ট বিগত কয়েক বছর ধরে মানবাধিকার ও শান্তির জন্য লড়াইয়ের উল্লেখযোগ্য সাক্ষ্যবহনকারীদের পুরস্কার প্রদান করে আসছেন। ২০১২-তে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে যখন এই পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল, তখন প্রথমে শর্মিলার মতামত নেওয়া হয়নি বলে প্রেস ক্লাবে জানালেন কলকাতায় তাঁর প্রতিনিধি হয়ে আসা বড়ো ভাই ইরম সিংহজিৎ। তিনি এও জানালেন যে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল যখন শর্মিলার সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন, তখন তাঁদের অনুমতি দেয়নি মণিপুরের স্বরাষ্ট্র দপ্তর। এমনকী তিনি কেন এই পুরস্কার নিতে পারছেন না সে কথা আদালতে সাংবাদিকদের সামনে বলার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও ইরম সিংহজিৎ-কে সেই অনুমতি দেওয়া হয়নি। তিনি বললেন, 'আমরা আজ এখানে এসেছি ইরমের প্রতিনিধি হয়ে আপনাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে।'

সিংহজিৎ আরও জানান, আমরা ইরমের পরিবারের লোকজন ইদানীং ওর সাথে দেখা করতে পারি না। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের থেকে অনুমতি নিতে হয়, যা পেতে আগে লাগত ১৫ দিন, এখন তা পেতে এক মাসও পেরিয়ে যায়। কেবলমাত্র প্রতি ১৫ দিন বাদে ওকে যখন আদালতে পেশ করা হয়, রুটিন হাইপ্রোফাইল বন্দি করে রাখার জন্য তখনই একমাত্র ওর সাথে দেখা করা সম্ভব। গত ২০০৯ সালে আমাদের মাতৃসমা মহাশ্বেতা দেবী ইরমের সাথে দেখা করার জন্য মণিপুর গিয়েছিলেন, কিন্তু

এরপর দুই-এর পাতায়

দক্ষিণ কলকাতায় গ্যাস পাচ্ছেন না অটোচালকরা

শ্রীমান চক্রবর্তী, কলকাতা, ২৫ অক্টোবর •

দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর থানা থেকে রুবি হসপিটাল রুটের অটোচালকদের প্রতিদিন অটোতে জ্বালানি হিসেবে এলপিজি ভরার সমস্যা রয়েই গেছে। প্রতিবারের মতো এবছরও উৎসবের দিনগুলোতে গ্যাসের আকাল পড়েছে। দক্ষিণ কলকাতার মধ্যে অটোর জ্বালানির জন্য প্রয়োজনীয় ফিলিং সেন্টার সর্বসাকুল্যে মোট ছয় থেকে সাতটি (গড়িয়া মহামায়াতলা, আনোয়ারশাহ রোড, রুবি সিমেন্সের পাশে তালবাগান, হাইড রোড, বেহালায় অজন্তা সিনেমা ও চৌরাস্তা, টালিগঞ্জ মহাবীরতলা)। এর মধ্যে মহাবীরতলা অধিকাংশ সময়েই বন্ধ থাকে। বাকিগুলোর সামনে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অটোচালকদের লাইনে দাঁড়াতে হয়। তারপর আছে বিভিন্ন লোকাল রুটের অটোচালকদের দাদাগিরি। তারা বিনা লাইনে গ্যাস নেয়। আনোয়ার শাহ রোডের গ্যাস ফিলিং সেন্টারে এই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়।

সরাসরি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রুবি-যাদবপুর থানা রুটের এক অটোচালক জানালেন, অটোতে এলপিজি ভরার ক্ষেত্রেও পাম্পগুলির কারসাজি রয়েছে। বেশ কয়েকটি ফিলিং সেন্টারে গ্যাসের মধ্যে হাওয়াও ভরা হয়, ফলে কেজি প্রতি মাইলেজ কমে যায়। এমনিতে মাইলেজ পাওয়া যায় ২০ থেকে ২২ কিমি। ভালোরকম ফিলিং ও ড্রাইভার ভালো হলে ২৫ কিমিও পাওয়া যায়। বর্তমানে কেজি প্রতি জ্বালানির দাম ৫০.২৫ টাকা। মাঝে মধ্যেই এলপিজির দাম বাড়ানো হয়। এও এক নিঃশব্দ বিপ্লব। গত দেড় বছরে নতুন কোনো গ্যাস ভরার কেন্দ্র তৈরি হয়নি, গড়িয়ায় ৪৫ নম্বর রুটের বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটি ফিলিং সেন্টার চালু হতে হতেও আটকে আছে শরিকি ঝামেলায়।

এছাড়া খুচরো পয়সার সমস্যা তো রয়েছেই। আগে আমরা দোকানে দোকানে খুচরো দিয়ে দিতাম, কিন্তু এখন আমাদের উল্টে খুচরো কিনতে হয় কখনো, বললেন পার্থ গায়েন, ওই রুটে দীর্ঘদিনের এক অটোচালক। এখন সামনে দু-জন নেওয়া বন্ধ, উপার্জন যেমন কমেছে, তেমনি বেড়েছে পুলিশি হয়রানি। শুধু ট্রাফিক নয়, থানার পুলিশও আজকাল দাঁড়িয়ে কেস দিচ্ছে। প্রতি মাসে আমাদের ইএমআই দিতে হয় ২২০০ টাকা করে, নতুন এলপিজি জ্বালানির অটো ব্যবহারের জন্য। সবকিছু মিলিয়ে আমাদের দৈনন্দিন ভোগান্তি দিন দিন বেড়েই চলেছে।

সম্পাদকের কথা

সর্বভারতীয় ধর্মঘট
তিথি–নক্ষত্র–পাঁজি দেখে কি দিন স্থির হয়

৪ সেপ্টেম্বর ২০১২ দিল্লিতে দেশের সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা মিলিত হয়ে স্থির করেছেন পরের বছর ২০১৩ সালের ২০–২১ ফেব্রুয়ারি তাঁরা সারা দেশে ধর্মঘট পালন করবেন। পাঁচ–ছয় মাস আগে আন্দোলনের দিন ধার্য করার এই রীতি–রেওয়াজকে সকলের নিন্দা করা উচিত। সত্যিকারের যদি কোনো সমস্যা শ্রমিক অথবা খেটে খাওয়া মানুষের থাকে, যদি সত্যিই তার জন্য কিছু করণীয় থাকে, তবে কোন যুক্তিতে ছ–মাস বাদে দিন স্থির হয়?

যেসব দাবি এই ধর্মঘটে তুলে ধরা হচ্ছে — মূল্যবৃদ্ধি দূর করা, বেকারত্ব ঘোচানো, নিম্নতম মজুরি স্থির করা, সম কাজে সম বেতন আদায়, সার্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি — কোনো দাবিই ছ–মাসের জন্য ফেলে রাখার মতো নয়। আসলে সংগঠিত আন্দোলনের নামে এ এক অদ্ভুত সংস্কৃতি তথা অভ্যাস তৈরি করেছে বাম–ডান নির্বিশেষে শ্রমিকনেতারা। যদি সমস্যা আজকের হয়, কেন আমরা আজই তার মোকাবিলা করব না? কেন আজই পথে নামব না? কেন ডিসেম্বর মাসে 'জেল ভরো' হবে জেলায় জেলায়? কেন পরের বছর জানুয়ারি মাসে শহিদ মিনারে সমাবেশ হবে? এটা কি এমন কোনো অনুষ্ঠান যার জন্য তিথি–নক্ষত্র–পঞ্জিকা দেখে শুভদিন স্থির করতে হয়?

আসুন, অন্যকে কিছু বলার আগে আমরা প্রত্যেকে নিজের বিবেককে প্রশ্ন করি। আমরা সাধারণ মানুষ কি মূল্যবৃদ্ধির গতিকে থামানোর জন্য কিছু করার কথা ভাবছি? আমরা কি মনে করি কোনো দল আমাদের 'প্রতিনিধি' হিসেবে এ নিয়ে কিছু লড়াই করতে পারে? প্রায় কেউই এমন মনে করে না।

কিন্তু গাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচে না, দল লড়াই ছাড়া বাঁচে না। দলের নেতারা মনে করে, 'লড়াই' না থাকলে তো দল তুলে দিতে হয়। অতএব যেনতেনপ্রকারেন 'লড়াই' চাই। তাই দলের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়াইয়ের কর্মসূচি নিতে হয় দল এবং দলীয় ট্রেড ইউনিয়নকে। ফি–বছর গতানুগতিকভাবে এইভাবেই ধর্মঘট ডাকা হয়ে চলেছে। এইভাবে 'ধর্মঘট' নামক লড়াইয়ের পন্থাটাকেই গুরুত্বহীন ও হাস্যকর করে তোলা হচ্ছে।

কলকাতার বড়ো মিডিয়া কি পশ্চিমবঙ্গে ধর্মীয় দাঙ্গায় উসকানি দিচ্ছে?

শমীক সরকার, কলকাতা, ২০ অক্টোবর •

১৮ অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের শীর্ষ কর্তারা বৈঠক করে ঠিক করেছে, উৎসবের মরশুমে সাম্প্রদায়িকতায় উসকানি দিতে পারে এমন এসএমএস চালাচালির ব্যাপারে কড়া ব্যবস্থা নেবে। এ ব্যাপারে উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে, কিছুদিন আগে অসম দাঙ্গার ঘটনা এবং মুসলিম বিরোধী এক চলচ্চিত্র নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের এসএমএস–এর বহর মারাত্মকভাবে বেড়ে গিয়েছিল। স্বরাষ্ট্র সচিব মোবাইল সংস্থার কর্তাদের নির্দেশও নাকি দিয়েছেন, জনমানসে হিংসার বাতাবরণ তৈরি করে, এই ধরনের এসএমএস চালাচালির ব্যাপারে কড়া নজরদারি চালাতে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে আমাদের দেশে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের তরফে কোনো সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভ ও প্রচার কর্মসূচি আটকাতে দেশের পুলিশ এবং প্রশাসন যথেষ্ট তৎপর।

কিন্তু একইভাবে দেশে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের উসকানি দিয়ে, তাদের কোণঠাসা করার মতলবে যে প্রচার কর্মসূচি জারি হয়েছে তাবড় মিডিয়ায় বিজ্ঞাপনের দৌলতে, সে সম্পর্কে পুলিশ প্রশাসনের সেই তৎপরতা আছে কি?

গত ১৬ অক্টোবর বাংলার সবচেয়ে বড়ো মিডিয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি প্রচারমূলক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় এবং তা কোনো পণ্যের বিজ্ঞাপন নয়, একটি সংগঠনের প্রচারপত্র। সংগঠনের নাম খুব ছোটো করে দেওয়া ছিল, রাষ্ট্রীয় গোরক্ষা সেনা, এবং গোরক্ষা সেবা সংঘ। বলাই বাহুল্য এই সংগঠন কোনো লোকপ্রিয় সংগঠন নয়। এবং সম্ভবত তা স্বাধীন কোনো সংগঠনও নয়, ভারতের হিন্দু মৌলবাদী শক্তি 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ'–এর ঘনিষ্ঠ কোনো শক্তি। বিজ্ঞাপনের বিষয় ছিল, বকর ঈদে গরু কুরবানি বন্ধ রাখার আহ্বান। এ প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়কে উল্লেখ করা হয়। বিজ্ঞাপনে সুচতুরভাবে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ব্যবহৃত বিভিন্ন পদবির কিছু লোকের নামোল্লেখ করে, তাদের বয়ানে গো–হত্যার বিরোধিতা উত্থাপন করা হয়েছে। সরাসরি বলা না হলেও, বিজ্ঞাপনে নরমে গরমে 'ভারতবাসী' মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের 'অনুরোধ' করা হয়েছে, 'আগামী বকর ঈদে গরু হত্যা করবেন না।'

বিজ্ঞাপনে বেশ কিছু কাল্পনিক তথ্যের অবতারণা করা হয়েছে, এবং কিছু অবৈজ্ঞানিক কথাও বলা আছে, যা নিঃসন্দেহে কুসংস্কারের সমতুল্য। যেমন, একটি 'রিসার্চ বই'–এর উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 'পশুদের সাময়িক (!) হত্যার থেকে উৎপন্ন ব্যথার তরঙ্গ এত শক্তিশালী হয় যে, তা সুনামি, ভূমিকম্প ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপদ ডেকে আনে।' গরুর সংখ্যা কমা, গরুর দুধের ঘাটতি এবং শিশুমৃত্যুকে এমনভাবে গাঁথা হয়েছে বিজ্ঞাপনে, তাতে দাঁড়িয়ে যায়, ঈদে গরু কুরবানির কারণে ভারতে শিশুমৃত্যু ঘটছে।

প্রসঙ্গত, ভারতবর্ষ সহ বহু দেশে মুসলিম সহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের পশুর মাংস খাওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। অমুসলিমদের বিভিন্ন উৎসবে পশুবলি পর্যন্ত দেওয়া হয়। এমনকী ভারতবর্ষেও গো–মাংস খাওয়ার রেওয়াজ কেবল মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষের নয়। উত্তর পূর্ব ভারতের বাসিন্দাদের মধ্যে ধর্ম নির্বিশেষে গরুর মাংস খাওয়ার চল আছে। অন্যদিকে কাশ্মীরি মুসলিমদের মধ্যে গরুর মাংস খাওয়ার চল অনেক কম। আবার বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে পশু এবং পাখি বলি দেওয়ার চলও রয়েছে আদিবাসী সমাজে, মুসলিম সমাজে, নিম্নবর্গের হিন্দু সমাজে এবং উচ্চবর্গের হিন্দু সমাজে। খোদ বকর ঈদেও কেবল গরু কুরবানি করা হয় না, মুরগি, ছাগল থেকে উট — নানা পশু পাখির কুরবানি হয়। আবার ভারতবর্ষে গরুকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করার চলও রয়েছে। এই বৈচিত্র্য নিয়েই আমাদের দেশ।

বিজ্ঞাপনে ২০১১ সালের ২ নভেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের একটি আদেশনামার কথা বলা হয়েছে, যাতে নাকি ১৯৯৪ সালে সুপ্রিম কোর্টের একটি অর্ডারে গরু কুরবানির ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল, তা কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে। প্রথমত, ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতা হাইকোর্টের ওই নির্দেশনামায় বলা হয়েছে, বকর ঈদে গরু বেচাকেনা ও কুরবানির জন্য কোনো সরকারি বা প্রশাসনিক কর্মচারী কোনো বন্দোবস্ত করতে পারবে না। এটুকুই। দ্বিতীয়ত, সুপ্রিম কোর্টের ১৯৯৪ সালের যে রায়ের কথা বলা হয়েছে, তার ভিত্তিতে তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'সানডে স্টেটসম্যান' পত্রিকায় ৩০ এপ্রিল ১৯৯৫ সালে একটি আবেদন রাখে, তাতে বলা হয়েছিল, 'সুপ্রিম কোর্টের একটি সাম্প্রতিক রায়ের কারণে আইনগতভাবে রাজ্য সরকার ১৯৫০ সালের পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী হত্যা নিয়ন্ত্রণ আইন–এর কোনো ছাড় দিতে পারে না কোনো 'স্বাস্থ্যবতী গাভী' বা 'গাভী' বা অন্য কোনো প্রাণী উৎসর্গে। এই পরিস্থিতিতে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সবচেয়ে বড়ো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল থেকে সরকার আন্তরিকভাবে আবেদন করছে শান্তি বিঘ্নিত না করার জন্য এবং আইন মেনে চলার জন্য।'

নদিয়া জেলার মদনপুর রেলস্টেশনে টিকিট কাউন্টারের সামনে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত গোরক্ষা সেনার বিজ্ঞাপনটি সাঁটা হয়েছে। ওপরে আনন্দবাজার পত্রিকার নেমপ্লেটটি ব্যবহার করে। উল্লেখ্য, গ্রাম অধ্যুষিত মদনপুরে হিন্দু–মুসলিম উভয় সম্প্রদায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকে, হিন্দুদের অনেকেই পূর্ববঙ্গীয়। সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোলের কোনো নজির নেই এখানে। ছবি তুলেছেন সম্রাট সরকার, ২৬ অক্টোবর।

আমাদের দেশের শাসন ব্যবস্থায় বিচারব্যবস্থা যেমন একটি স্তম্ভ, তেমনি নির্বাচিত সরকারও একটি স্তম্ভ। তবে এসবের থেকেও অনেক পুরোনো এবং চিরাচরিত আমাদের দেশের মানব সমাজ। সেই সমাজের ঐতিহ্যই হল বিভিন্ন, বিচিত্র এবং কখনো কখনো পরস্পরবিরোধী প্রথার সহাবস্থান। সেসব প্রথার সংস্কার হয়, কখনো তা পাল্টাতেও পারে, কিন্তু তা একান্তই সমাজের ভেতর থেকেই পাল্টায়, সরকারি নিদান বা বিচারব্যবস্থার রায় চাপিয়ে কখনোই তা সম্ভব হয় না। বাইরে থেকে প্রচারপত্র বিলি করে উপদেশ দিয়েও না। তাই ভারতে ইসলামিক চিন্তার একটি ধারা দারুল উলুম দেওবন্দের কোনো ব্যক্তির বক্তব্য, 'বকর ঈদে গরু কুরবানি এড়িয়ে চলুন' এবং সেই বক্তব্যকে 'গো–মাতাকি জয়' স্লোগান দেওয়া 'গোরক্ষা সেনা'র প্রচারপত্রে হাজির করা ভিন্ন মাত্রাবাহী। দ্বিতীয় কাজটি নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িক উসকানি এবং ভাগাভাগির উদ্দেশ্যে ঘটানো, আমাদের দেশে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার দীর্ঘ ইতিহাসে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির প্রচারের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটু চর্চা করলেই তা পরিষ্কার হয়। আশা করা যায়, প্রায় শতাব্দী প্রাচীন পত্রিকা আনন্দবাজার–এর তা অজানা নয়।

একই সাথে আরও একটি কথা বলার। যে কোনো প্রাণীহত্যাই ভালো কাজ নয়, কেবল গরু হত্যা নয়। বিয়ে, পার্টি, উৎসব উপলক্ষে আমাদের নাগরিক সমাজে যে লক্ষ লক্ষ ছাগল, মুরগি হত্যা করা হয়, তাও ভালো নয় কোনোমতেই। কিন্তু প্রাণীহত্যা বেশিরভাগ মানব সমাজেরই একটি চালু প্রথা, আমরাও হয়তো ব্যক্তিগত জীবনে তা করে থাকি, এবং সেগুলি মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। এরই সাথে আরও একটি কথা বলার, প্রাণী হত্যার দুই ধরন আছে, একটি ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য। আরেকটি ভোগ বিলাস ও আমোদ–প্রমোদের জন্য। নাগরিক সমাজের প্রাণী হত্যার মধ্যে এই দ্বিতীয় ধরনের প্রাবল্য। তা আরও বেশি নিন্দনীয়।

কিন্তু ঈদের কয়েকদিন আগে, বড়ো মিডিয়ায় কেবল গরু কুরবানি বিষয়ক প্রচারপত্র একটি মারাত্মক ইঙ্গিতবাহী। তা যে এমনকী শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় ১৯৯৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জারি করা 'আবেদন'–এ, যার কথা একটু আগে বলা হয়েছে। আসাম দাঙ্গা, মুসলিম ধর্মবিরোধী ব্যঙ্গচিত্র প্রভৃতির পটভূমিতে এ বছর বাংলার সবচেয়ে বড়ো মিডিয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রায় হাফ পেজ বিজ্ঞাপনে এই প্রচারপত্র কি একভাবে সাম্প্রদায়িক হিংসার উসকানি নয়? হিন্দুত্ববাদী একটি সংগঠনের প্রচারপত্র বিজ্ঞাপন হিসেবে প্রকাশ করে পত্রিকাটি কি ওই সংগঠনের চেয়েও বেশি মাত্রায় এই উসকানির দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছে না? তাহলে কি টাকা দিলে সবই ছাপা যায়? অচিরাচরিত মিডিয়া, যথা ইন্টারনেট ও মোবাইল এসএমএস মারফত সাম্প্রদায়িকতার প্রচার বিষয়ে প্রশাসনের কড়া মনোভাবের পরিচয় তো পাওয়া গেছে, বড়ো প্রিন্ট মিডিয়া কি এর আওতার বাইরে? এখনও পর্যন্ত তো এই বিষয়ে রাজ্য প্রশাসনের কোনো কথা শুনতে পাইনি। আরও গভীর উদ্বেগের বিষয়, মুসলিম সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে প্রশাসন বেশ তৎপর, কিন্তু সংখ্যাগুরুর ধর্মীয় মনোভাবের প্রতিনিধিত্ব দাবি করা সংগঠনের মুসলিম বিরোধী সাম্প্রদায়িকতার উসকানি নিয়ে প্রশাসনের সেই তৎপরতা কোথায়? এই উসকানি এড়িয়ে গেলে, তা কিন্তু ভবিষ্যতে আরও বড়ো হিংসার জন্ম দিতে পারে। সেই ইঙ্গিত গতবছর ২০১১ সালে বকর ঈদের প্রাক্কালে গোরক্ষা সেনার নেতাদের কার্যকলাপে স্পষ্ট। এই কার্যকলাপের বিবরণ পাওয়া যায় সাম্প্রদায়িক, মুসলিমবিরোধী, হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির মুখপত্র এবং ওয়েবসাইটে। সেখান থেকেই নিচে তা তুলে দেওয়া হল :

'কলকাতা হাইকোর্টের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় গোরক্ষা সেনার প্রধান শ্রী আশু মোঙ্গিয়া, আর্য বীর দলের পণ্ডিত যোগেশ শাস্ত্রী এবং আরও কিছু গো–ভক্ত কলকাতার দমদম এলাকার কিছু জায়গায় ২–৩ নভেম্বর রাতে হানা দেন কলকাতায় বেআইনি গরু পরিবহণ ধরার জন্য। তাঁরা কিছু গরু এবং বাছুর আটক করলেও পুলিশ তা কসাইদের এবং পরিবহণকারীদের নিয়ে যেতে দেয়। ...

এই সময় আশু মোঙ্গিয়া এবং অন্যান্য গোরক্ষাকারীদের সঙ্গে হাতাহাতি হয় এবং তাদের ওপর মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে মুসলিম গুণ্ডারা। পুলিশ তাদের উদ্ধার করলেও, কর্তব্যরত পুলিশরা মুসলিম পরিবহণকারীদের গরুগুলিকে কলকাতার বেআইনি বাজারগুলিতে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। ...'

আইন নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে স্পষ্টতই এই ইস্যুটিকে নিয়ে দাঙ্গা বাধাতে তৎপর হয়েছে ওই মৌলবাদী হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি। এবছরও যদি তারা একই কাণ্ড ঘটায়, তাহলে তাদের প্রচারপত্র বিজ্ঞাপন হিসেবে ছেপে তাদের দাঙ্গা বাধাতে মদত দেওয়ার দায় বড়ো মিডিয়া আনন্দবাজার পত্রিকা অস্বীকার করতে পারে কি?

পুনশ্চ : অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ জুড়ে কলকাতার এন্টালি এলাকায়, যেখানে হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বাস, সেখানে কুরবানির ঈদের গরু রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তাতে বাধা প্রদানকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাম্প্রদায়িক টানাপোড়েন চলছে।

পরিবেশকর্মীর মোবাইলের সিম আটকে পুলিশি দমন

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, ৩১ অক্টোবর •

পরিবেশ ও অধিকার আন্দোলনের কর্মী কুণাল গুহ রায় ১৪ জুলাই ২০১২ সকালে সাড়ে ন–টা নাগাদ দেখেন, তাঁর এমটিএস কোম্পানির মোবাইল ফোনটি কাজ করছে না। পরে জানতে পারেন, রাজ্য পুলিশের সদর দফতর লালবাজার সাইবার ক্রাইম বিভাগের হস্তক্ষেপে কোম্পানিটি তাঁর মোবাইল ফোনের সিমকার্ডটি ব্লক করে দিয়েছে। সাইবার ক্রাইম দফতরে খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারেন, জোড়াসাঁকো থানায় তাঁর বিরুদ্ধে 'তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০০'–এর ৬৬এ ধারায় (ধ্বংসাত্মক বার্তা প্রচার, মিথ্যে বার্তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রচার করলে তিন বছর পর্যন্ত সাজা ও জরিমানা হতে পারে) একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। মামলাতে তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তিনি 'দধিচি মোবাইল নিউজ লেটার'–এর সাধারণ সম্পাদক, যা তিনি মোটেই নন। এই মামলার ফলশ্রুতিতেই তাঁর মোবাইল ফোনের সিম আটকানোর নির্দেশ। বস্তুত, আইনের ওই ধারায় কোনো পুলিশ বা প্রশাসনিক কর্তাকে কারোর সিম ব্লক করার অধিকার দেওয়া হয়নি, তবুও পুলিশ এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। কুণালবাবু জোড়াসাঁকো থানায় খোঁজখবর করলে সেখান থেকে বলা হয়, ওপরওয়ালাদের নির্দেশে এই বিষয়ে কোনো তথ্য দেওয়া যাবে না। পরে আইনজ্ঞের সাহায্যে তিনি জানতে পারেন, জোড়াসাঁকো থানায় তাঁর বিরুদ্ধে ৪ জুলাই একটি এফআইআর দায়ের করে জনৈক ওজাইর আহমেদ। তাতে বলা হয়, তিনি শান্তি বিঘ্নিতকারী বার্তা প্রচার করেছেন। কিন্তু কুণালবাবু যে বার্তাটি এসএমএস মারফত প্রচার করেছিলেন সেটি হল, 'মমতার সরকার সরকারের পয়সায় মুসলমানের ভোট কিনছেন। মুসলমান অঞ্চলে গিয়ে মুসলমান সাজছেন, ৯৯% মুসলমানের জন্য চাকরির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। ইমাম মোয়াজ্জানদের মাসিক ভাতা দেবার কথা বলছেন। এই কাজগুলো সংবিধান বিরোধী।' এফআইআর–এ পুরো বার্তা টি না তুলে প্রথম ১৬টি শব্দ তুলে অভিযোগ করা হয়েছে।

কুণালবাবুর বক্তব্য, এইভাবে মোবাইলের সিম কার্ড আটকানো সম্পূর্ণ বেআইনি, তাঁর সামাজিক কাজকর্মকে আটকে দেওয়ার চেষ্টা, তাঁর জীবনধারণ ও স্বাধীন মতপ্রকাশের সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। তিনি একটি রিট পিটিশন করেন কলকাতা হাইকোর্টে ১২ অক্টোবর, তাঁর মোবাইলের সিম সচল করা এবং জোড়াসাঁকো থানার মামলা প্রত্যাহার চেয়ে। ১৭ অক্টোবর বিকেল পৌনে পাঁচটায় তিনি একটি ফোন পেয়ে বুঝতে পারেন, সিম সচল করে দেওয়া হয়েছে। সরকারি উকিল আদালতে জানান, তদন্তের জন্য সরকার সিমটি আটকেছিল।

ফৈজাবাদ সাম্প্রদায়িক হিংসার নিন্দা

অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফোরাম–এর প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ২৬ অক্টোবর •

উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদ শহরে ২৪ অক্টোবর ২০১২ তারিখে দুর্গা প্রতিমার বিসর্জনের সময় একটি মেয়ের শ্লীলতাহানি করে কিছু দুর্বৃত্ত। এই ঘটনাকে অজুহাত করে কিছু মানুষ কাছাকাছি এলাকায় পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। ফৈজাবাদ জুড়ে একটি গুজব–ও ছড়ায়, মুসলিমরা পাথর ছুঁড়ছে। একদল মানুষ মুসলিম ব্যবসায়ীদের প্রায় ২৫টি দোকান পুড়িয়ে দেয়। তারা 'আপ কি তাকত' নামে একটি দ্বিভাষিক (উর্দু ও হিন্দি) কাগজের অফিসেও ভাঙচুর চালায়। এই কাগজটি ধারাবাহিকভাবে শান্তির পক্ষে এবং হিন্দু–মুসলিম ঐক্যের পক্ষে কথা বলছিল। একটি মসজিদেও ভাঙচুর চালানো হয়।

স্থানীয় সমাজকর্মী যুগল কিশোর শাস্ত্রীর মতে এটি পূর্ব পরিকল্পিত আক্রমণ। কাগজটির সম্পাদক বেহদি মনজরের মতে, এটি শান্তির আওয়াজকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা। পুলিশ অনেকক্ষণ পরে অকুস্থলে পৌঁছায় এবং দায়সারাভাবে হস্তক্ষেপ করে। একইভাবে দমকলের গাড়িগুলিও আসে চার ঘন্টা পরে, ততক্ষণে দোকানগুলি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত।

অযোধ্যার কাছে ফৈজাবাদ, শান্তির প্রতীক। সাম্প্রদায়িক শক্তির দ্বারা মুসলিম দোকানগুলি, মসজিদ এবং 'আপ কি তাকত'–এর অফিস আক্রমণ কঠোর নিন্দাযোগ্য। আমরা স্থানীয় এবং রাজ্যের প্রশাসনের কাছে শান্তি ফেরানোর জন্য আবেদন করছি এবং যারা হিংসার শিকার তাদের জরুরি ভিত্তিতে পুনর্বাসনের। ওই দোকানগুলির মালিকদের এবং 'আপ কি তাকত' পত্রিকার অফিসের মালিককে অতি দ্রুত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। কর্তব্যে গাফিলতির জন্য দমকল এবং পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হোক। দোষীদের আইন মেনে সাজা হোক।

আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ার, এল এস হারদেনিয়া, রাম পুনিয়ানি, ইরফান এঞ্জিনিয়ার, মোহাম্মদ আরিফ

প্র থ ম পা তা র প র শর্মিলা

অনেক আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও কয়েকদিন অপেক্ষা করে তাঁকে দেখা না করেই ফিরে আসতে হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও জানান ২০০৪ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মণিপুরের আফস্পা–র অপব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে একটি বিচারভাগীয় কমিশন গঠন করেছিলেন। তার রিপোর্ট কমিশন পেশ করলেও তা প্রকাশ করা হয়নি। তবে জানা গেছে আফস্পা আইন সংশোধনের কথা বলা হয়েছে। বিষয়টি এখনও ক্যাবিনেট সাব–কমিটির কাছে রয়েছে।

তিনি আরও জানান ১৯৬০ সাল থেকে এই দমনমূলক আইন যে সমস্যার মোকাবিলার জন্য প্রয়োগ করা শুরু হয়েছিল তা ক্রমশ তার ভৌগোলিক সীমাকে বাড়িয়ে চলেছে। কাশ্মীর সহ অন্যত্র এই আইনের প্রয়োগ করা হচ্ছে। সম্প্রতি কয়েকবছর আগে যখন ছত্রিশগড়ে মাওবাদী মোকাবিলার বিশেষ আইন প্রয়োগের কথা বলা হয় এবং বায়ু সেনার কপ্টার ব্যবহারের কথা ওঠে তখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সাংসদদের পক্ষ থেকে তার বিরোধিতা করা হয় এবং বলা হয়, আমাদের ভাই–বোনেদের কেউ কেউ বিপথে গেলেও তাদেরকে দেশদ্রোহী আখ্যা দেওয়া ঠিক নয়। আমার প্রশ্ন হল, তাহলে আমরা মণিপুরের মানুষরা কি আপনাদের ভাই নই?

পুরস্কার প্রদান করতে গিয়ে মহাশ্বেতা দেবী ইরম শর্মিলার কথা, তাঁর লড়াইয়ের কথা ছোটোদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার আবেদন জানান।

বীরভূম আদিবাসী গাঁওতা সংবাদ

কৃশানু মিত্র, বেলুড়, ৩০ অক্টোবর। বীরভূমের পাথর খাদানের পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক দূষণের বিরুদ্ধে ২০১০ সালে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এই 'বীরভূম আদিবাসী গাঁওতা' সংগঠনের নেতৃত্বে •

যা দেখলাম

১৫ অক্টোবর মল্লারপুর স্টেশন ছেড়ে চলার শুরু, উদ্দেশ্য মাসারা পঞ্চায়েতে অবস্থিত জামকান্দর শাখার অনুষ্ঠান বা জমায়েত যেখানে বীরভূম আদিবাসী গাঁওতা বিরাট জনসভার আয়োজন করেছে। পূর্ব অভিজ্ঞতায় জানি, এ এক নরককুণ্ড। ট্রাক চলার পথ অন্য গাড়ির অগম্য। স্টেশন ছেড়ে গাড়ি কিছু দূর এগোতেই দেখা গেল জল সিঞ্চনের গাড়ি যা আগে দেখিনি। শুনলাম ট্রাক পিছু (চেকপোস্ট করে) জেলা পরিষদ ১০০ টাকা সংগ্রহ করছে তাই জলগাড়ির এই পিচকারির ব্যবস্থা। রাস্তা উন্নয়নে পয়সা সম্ভবত খরচা হয় না, তাই ভাঙাচোরা রাস্তা ছেড়ে সমান্তরাল জঙ্গলের লাল মাটির ওপর দিয়ে গাছের ফাঁক গলে গলে ছোটো গাড়ি চলে। সেই পথই আমাদের সাথী। মলুটিকে ডাইনে ফেলে আমরা এগিয়ে গেলাম। পিচকারি গাড়ি জনপদের বাইরে আর দেখা গেল না। অধিবাসীরা বললেন, টাকা তুলছে তো, তাই নাম কা ওয়াস্তে এই ব্যবস্থা।

আজ সারা মহল্লায় বনধ বীরভূম আদিবাসী গাঁওতার ডাকে। মাসার পঞ্চায়েতে জমায়েত হবে মানুষ, বিভিন্ন দাবিতে। বোনাসের দাবিতে গুলুন্ডায় রাস্তা অবরোধ চলেছে ১২ অক্টোবর থেকে চারদিন। ট্রাক ড্রাইভারদের সংগঠনও একই উদ্দেশ্যে মিটিং করছে আজ, জানালেন প্রসেনজিৎ পাউরিয়া। আমি দাবিগুলির সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে চাইলে উনি জানালেন, ক্রাশার মালিকরা দেওয়া প্রতিশ্রুতি মানছে না। ক্রাশিংয়ের সময় বাতাসে যে পাথর ডাস্ট ওড়ে তা বাতাসে সাঙ্ঘাতিক দূষণ সৃষ্টি করে। শাওয়ার লাগালে জলের ধারায় এই ডাস্ট কাদায় পরিণত হয়। দূষণের অব্যাহতি হয়, কিন্তু মাত্র তিন শতাংশ মালিক এই ব্যবস্থা করেছে। আমরা কাছের এক খাদানে দূষণ নিয়ন্ত্রক দেখলাম, যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কারণ ক্রাশিংয়ের প্রতিটি স্তরে শাওয়ারের ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী হওয়া উচিত। সরকারি ভাবে বৈধ খাদান/ক্রাশারে সংগঠনের সমর্থন আছে। আগ্রাসী অবৈধ খাদান সংস্কৃতি এলাকার জীবিকা ও জনস্বাস্থ্যে থাবা বসিয়েছে। তাও প্রিস্ট মুর্মুকে দেখা গেল জমায়েতে। সত্তর ঊর্ধ্ব প্রিস্ট পেশায় চাষি, সামান্য দু-এক বিঘা জমি আছে, কোনোরকমে জমি আঁকড়ে বেঁচে থাকা। যে কোনোদিন জমি হাঙরদের দখলে চলে যেতে পারে। ব্লাস্টিংয়ের সমস্যা আরও ভয়ানক। গতবছর ১৫ নভেম্বর প্রসেনজিতের ভাই মাইকেল পাউরিয়া ও স্বপন সোরেন ব্লাস্টিং কম্পনে ঘর ভেঙে চাপা পড়ে মারা যান। তাই গ্রামে ব্লাস্টিং করলে প্রতিটি ঘর শক্তপোক্ত করে বেঁধে দেওয়াও এদের দাবির অন্তর্ভুক্ত। পঞ্চানন মুর্মু জানালেন, মল্লারপুর থেকে জামকান্দর পর্যন্ত প্রায় ২০০টি খাদান/ক্রাশার আছে। এখানে মালিকদের অধিকাংশই বাইরে থেকে আসা। দশ থেকে পনেরো শতাংশ মালিক এখানকার। বড়ো চাষি বা লরির ড্রাইভারি এদের পেশা ছিল। মোজাম্মেল শেখ এমনই এক মানুষ, যাঁর বাবা জমি বিক্রি করে ক্যানেলের ধারে জমি কিনে চলে গিয়েছিলেন চাষাবাদ করবেন বলে। কিন্তু পরে দেখা গেল, এই জমির নিচে পাথর আছে। তখন এখানে আবার জমি কিনে ক্রাশার তৈরি করলেন। প্রসেনজিৎ পাউরিয়ার কথায় বলা যায়, জমির পর জমি চলে যাচ্ছে, অথচ গ্রামে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে না। পনেরো বিশ বছর আগে মানুষের দূষণজনিত রোগ অন্তত ছিল না। পূজার থানও বাদ যাচ্ছে না, সাঁওতালদের পবিত্র পূজার জাহের থানও আগ্রাসনের কবলে। সরকার পাল্টেও কোনো লাভ হয়নি। আমলাতন্ত্রের রূপ একই রয়ে গেছে।

এখন দুপুর দেড়টা। স্টেজ প্রস্তুত, হঠাৎই দেখা গেল, গাঁওতা সভ্য বাবুলাল মুর্মু ঝুমুর দলকে প্রস্তুত হতে বলছেন। বোঝা গেল, নেতারা আসছেন, তাঁদের বরণ করতে হবে। সাঁওতালি প্রথা মেনে নাচগান বন্দনায় নেতারা স্টেজে আসন গ্রহণ করলেন, রবিন সোরেন, সুনীল সোরেন, আরও অনেকে। বয়োজ্যেষ্ঠ প্রিস্ট মুর্মু বয়সের কারণে স্থান পেলেন স্টেজে। রথিন সোরেনের গানে জমে উঠল জনসভা। বিভিন্ন বক্তব্যের মিঠেকড়া মিশেলে চার্জড হল জনগণ। আদিবাসী গাঁওতার আন্দোলনের ইতিহাস বিবৃত হল, কীভাবে চরকা দিয়ে অবৈধ খাদানের বিস্তারে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে গাঁওতা। কীভাবে চল্লিশ হাজার মানুষ সরকারি অফিস ঘেরাও করেছে, তার কথা। কিন্তু নেতৃত্বের অনেকেই আশু সমস্যা হিসেবে উৎনৌ সংগঠনের অপপ্রচারকে দেখাতে চাইলেন। উৎনৌ নেতৃত্ব কীভাবে অতীতের লড়াই ভুলে গিয়ে বৃহৎ পুঁজির (পড়ুন নেউটিয়া নামক পুঁজিপতি) স্বার্থে গাঁওতা আন্দোলনে চরকা দিতে চাইছেন তার কথা উঠে এল। কাদরা কিস্কু বললেন, রবিন সোরেনকে ধরতে চেয়ে ওরা গাছে উঠতে গিয়ে হড়কে পড়ে গেছে। ওদের মিটিংয়ে কেন লোক হয় না, কারণ জনমত ওদের সঙ্গে নেই। আমাদের মিটিংয়ে আমজনতা এসেছে হেঁটে, সাইকেলে চড়ে। এই জনজোয়ার গণভিত্তি ছাড়া সম্ভব নয়। এ শহরের কোনো রাজনৈতিক মিটিং নয় যে লরি বাসের পেছনে খরচা করে লোক আনা হয়েছে। শালবন গমগম করে উঠছে মুখরিত জনজোয়ারে। এর আগে বীরভূম খাদান অঞ্চলে কারও রেশন কার্ড ছিল না। গাঁওতার আন্দোলনেই তা হয়েছে। আদিবাসী সমাজে আগে সমাজ, পরে রাজনীতি। এখানে কোনো আপস নেই। বাবুলাল মুর্মু বললেন, রবীন তো উৎনৌ-র কর্মী ছিলেন। ওদের দুর্নীতির জন্যই সংগঠন ছেড়েছেন। উনিই প্রকৃত জনগণের সঙ্গে থাকা জননেতা। উৎনৌ-র শহুরে বাবুরা সাঁওতাল সমাজকে ভাঙার খেলায় মেতেছেন। ওঁরা ভারত জাকাত মাঝি মারোয়া, যার কোনো জনভিত্তি নেই, তার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে আদিবাসী সমাজকে দ্বিখণ্ডিত করে বৃহৎ পুঁজির সুবিধা করতে চাইছেন।

আমার ভাবনা

আদিবাসী জনতার মঞ্চে মিনারেল ওয়াটার দেখে খটকা লাগে কারণ বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বৃহৎ পুঁজির আগ্রাসন রোধে মিনারেল ওয়াটার সাথি না হওয়া আশু কর্তব্য। নেতৃত্বকে মাটির কাছাকাছি থাকতে হবে এবং রাজনৈতিক বক্তব্যকে স্পষ্ট করতে হবে। তাঁরা কি বৈধ ছোটো পুঁজির পক্ষে লড়তে চান মানুষকে সাথে নিয়ে মানুষের জন্য? আন্দোলনের সাথে সাথে তাঁদের গঠনমূলক ভাবনা কী কী আছে? কাষ্ঠপোড়ায় ৮/১০ কিমি দূরে ডাক্তার পাওয়া যায়, মল্লারপুরে বারো ক্লাস পড়তে যেতে হয়, প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা কম, কী কী বিকল্প ভাবনা সংগঠনের আছে? সংগঠন যদি ঠিক পথে থাকে গঠনমূলক পথ চলাই তার হয়ে জবাব দেবে। মঞ্চে হবে শুধু বিকাশের কথা, সংঘর্ষের কথা, যৌথ আলাপচারিতা।

সপ্তমীর দুপুরে 'বিদ্যাধরী' ছোটো পত্রিকা জন্ম নিল

শ্রীমান চক্রবর্তী, বিদ্যাধরপুর, ২৯ অক্টোবর •

গত সপ্তমীর দুপুরে বিদ্যাধরপুর স্টেশন সংলগ্ন একটি নির্মীয়মান বাড়ির দোতালায় 'বিদ্যাধরী' পত্রিকার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। সভার শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন মৃন্ময় চক্রবর্তী। 'বিদ্যাধরী' পত্রিকার এই সংখ্যার সম্পাদক শ্রী শম্ভুনাথ মণ্ডল বলেন, আজকের দিনে আমরা প্রতিদিন বেঁচে থাকার জন্য যে মৌলিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি তার উৎসমুখ থেকে আমাদের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দিতে এক নগ্ন সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। যার সরাসরি বিরোধিতা করা আজকের দিনে ক্রমশই কঠিন হয়ে পড়ছে। আমাদের চেষ্টা নিজেদের সংস্কৃতির চর্চার নানা দিকগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিই তার প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠতে পারে। এই প্রস্তুতি সংখ্যাটি প্রকাশে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন ছোটো পত্রিকার সম্পাদকগণ সহযোগীতা করেছেন। আপাতত সংখ্যাটি ত্রিমাসিক করার কথা ভাবা হয়েছে।

স্বাগত ভাষণের পর ছোট্ট মেয়ে পায়েল নস্কর 'আমার আনন্দিনী উমা যে আসেনি তার মায়ের কাছে' গান গেয়ে অনুষ্ঠানে এক নতুন মাত্রা যোগ করল। এর পর পত্রিকার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সুন্দরবন অঞ্চলের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক-নৃতাত্ত্বিক গবেষক শ্রী সঞ্জয় ঘোষ মহাশয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক ও সমালোচক শ্রী সুখেন্দু মাইতি। তাঁর কথায় গ্রামীণ লোকায়ত সংস্কৃতির নামে পত্রিকার বিভিন্ন বিভাগের নামকরণ অবশ্যই ইতিবাচক ভাবনা। ছোটোদের লেখা, আঁকা, গল্প, কবিতা, নাটক, যাত্রাপালাসহ বিভিন্ন উপাদানে সমৃদ্ধ হয়েছে পত্রিকাটি। পাশাপাশি তিনি লেখা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্পাদককে সতর্ক করেছেন। শ্রী অর্ধেন্দু বসু ছোটোদের সৃজনী শক্তির বৃদ্ধির জন্য এধরনের পত্রিকার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন। শ্রী মৃন্ময় চক্রবর্তী বলেন পত্রিকাটি লেখক-শিল্পী ও সম্পাদকদের মধ্যে যোগাযোগের একটি প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠতে পারে। শ্রী শাজাহান গাজী বলেন কবি, সাহিত্যিকরা সমাজের গভীরে পৌঁছে যেতে পারেন এবং সেখান থেকেই তাঁরা আলোর সন্ধান দেন। শাসকের দল আত্মগর্বে যে সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে চাইছে ছোটো পত্রিকা তার বিরুদ্ধেই গর্জে ওঠে। আত্ম-অহঙ্কার, সংকীর্ণতা যেন আমাদের গ্রাস করতে না পারে সেই জন্যই ছোটো পত্রিকার প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানে স্বরচিত দুটি কবিতা পাঠ করেন বিপদতারণ নস্কর। তিনি 'বিদ্যাধরী' নামের তাৎপর্য জানতে চান। এবং সাথে সাথে এই অঞ্চলে মজে যাওয়া বিদ্যাধরী নদীর গতিপথ ও তার ওপর বসবাস করতে থাকা মানুষরূপী জমিরাক্ষসদের সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুচেতনা, রূপান্তর, আলোর প্রদীপ পত্রিকার সম্পাদকগণও। শ্রী কুমারেশ নস্কর দেশজ লোকসংস্কৃতির উপর গুরুত্ব আরোপের কথা বলেন। সপ্তমীর দুপুরে ছোটো বড়ো মিলিয়ে প্রায় ২৬ জন উৎসাহী সাহিত্যপ্রেমী মানুষের উপস্থিতি এক অন্য বার্তা বহন করে।

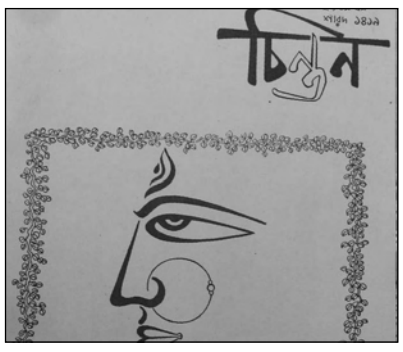

প্রকাশ পেল শারদ চিন্তন ও সপ্তপর্ণী

সংবাদমন্থন প্রতিবেদন, মেটিয়াব্রুজ, ২৮ অক্টোবর •

হুগলি নদীর তীর ঘেঁষে শহর কলকাতার এক প্রান্তিক অংশ বদরতলা। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের যৌথ বাসভূমি বদরতলা থেকে দীর্ঘ উনত্রিশ বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছে 'চিন্তন' সাহিত্যপত্রিকা। সরকার পোষিত বদরতলা পাবলিক লাইব্রেরিও দীর্ঘ পনেরো বছর যাবৎ প্রকাশ করে চলেছে আর এক সাহিত্যপত্র 'সপ্তপর্ণী'। দুটি পত্রিকার শারদ সংকলন প্রকাশ পেল গত ২০ অক্টোবর শনিবার বদরতলা পাবলিক লাইব্রেরির পাঠকক্ষে। নির্ধারিত সময় থেকে বেশ কিছুটা দেরিতে শুরু হলেও ছোট্ট পাঠকক্ষটি ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংগীত পরিবেশন করেন গীতা পাল। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান সাংস্কৃতিক-সংগঠক নিখিলরঞ্জন জোয়ারদার, 'বাংলার সমৃদ্ধ অঙ্গন' পত্রিকার সম্পাদক হৃষীকেশ পাল, মন্থন সাময়িকী পত্রিকার সম্পাদক জিতেন নন্দী এবং কবি বিশ্বজিৎ রায়। চিন্তন পত্রিকার পক্ষে সম্পাদক অঞ্জন পাল পত্রিকা প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁদের যে লড়াই এবং শেষ পর্যন্ত সেই লড়াইতে জয়ী হয়ে পত্রিকা প্রকাশ করার কথা বলেন। সপ্তপর্ণীর পক্ষে সম্পাদক সুব্রত মজুমদারের বক্তব্যে ফুটে ওঠে লাইব্রেরির কর্মপ্রক্রিয়া, তার দিশা এবং সপ্তপর্ণীর মাধ্যমে তাদের সাহিত্য আন্দোলনে শামিল হওয়ার প্রসঙ্গ। এরপর পত্রিকাদুটি প্রকাশ করেন নিখিলরঞ্জন জোয়ারদার। মোড়ক খুলে তা তুলে দেন কবি বিশ্বজিৎ রায়ের হাতে। অনুষ্ঠানে সম্মাননা জানানো হয় প্রবীণ নাট্যব্যক্তিত্ব সদানন্দ পাল এবং বিশিষ্ট মৃৎশিল্পী বাসুদেব কর্মকারকে। বাসুদেব কর্মকার ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। সদানন্দ পালের হাতে মানপত্র, শাল এবং মিষ্টান্ন তুলে দেন তপন রায়। এই সম্মাননায় আপ্লুত সদানন্দ পাল অল্প কথায় বলেন তাঁর নাট্যচর্চার কথা, বদরতলা লাইব্রেরির কথা।

মঞ্চে উপস্থিত অতিথিরা তাঁদের বক্তব্যে চিন্তন, সপ্তপর্ণী তথা লিটল ম্যাগাজিন এবং মহেশতলা-মেটিয়াব্রুজের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চর্চা নিয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা ও ভাবনা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন কবি প্রশান্ত দাস ও কবি স্বপন কুমার সেন। আবৃত্তি পরিবেশন করেন সনৎ মাঝি ও সম্প্রীতি সাঁপুই। এছাড়া বিভিন্ন সাহিত্য ব্যক্তিত্বের জন্মশতবর্ষ ও সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন নিয়েও কিছু আলোচনা হয়। বদরতলার সন্তান গণ-কবিয়াল গুরুদাস পালের জন্মশতবর্ষের প্রসঙ্গও আলোচনায় অগ্রাধিকার পায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কথাকার শান্তনু ভট্টাচার্য।

পত্রিকার পাতা থেকে

বিদ্রোহী শ্রমিকের দুই রূপ —

কারখানা দখল এবং ম্যানেজারকে পুড়িয়ে মারা

মারুতি সুজুকি মানেসর ডায়েরি (৬)

শের সিং সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'ফরিদাবাদ মজদুর সমাচার' থেকে •

আজ থেকে একবছর আগে ৭ অক্টোবর ২০১১, আইএমটি-মানেসরে এগারোটি কারখানা শ্রমিকেরা দখল করে নিয়েছিল। এটা ঘটেছিল শুধুমাত্র মারুতি-সুজুকির মানেসর ইউনিটে নয়, ইন্ডাস্ট্রিয়াল মডেল টাউন (আইএমটি) মানেসর জুড়ে মোট এগারোটি কারখানায়। এটা ছিল শ্রমিকদের দিক থেকে এক 'অবাস্তব' পদক্ষেপ। একবছরের মধ্যে দু-দুবার ঘটল শ্রমিকদের এই কারখানা দখল (তার আগে ২০১১ সালের ৪ জুন প্রথমবার ১৩ দিন যাবৎ মারুতি-সুজুকির এই মানেসর ইউনিটটা দখল করে নিয়েছিল।)। 'বাস্তব' জগতে ফিরে এসে শ্রমিকেরা পরদিন ৮ তারিখ সাতটি কারখানার ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়। সেগুলিতে কোম্পানিদের দখল ফিরে আসে। সেদিন থেকে সুজুকি গোষ্ঠীর বাকি চারটি কারখানায় শ্রমিকদের দখল চলতে থাকে। এক শ্রমিকের ভাষায় : ৭ থেকে ১৪ অক্টোবর (২০১১) মারুতি-সুজুকি কারখানার ভিতর এক দারুণ সময় ছিল। না ছিল কোনো কাজের টেনশন, না ছিল আসা-যাওয়ার হয়রানি। বাস ধরবার চিন্তা ছিল না। খাবার তৈরির টেনশন ছিল না। এমনকী খাবার খাওয়ার চিন্তাও ছিল না যে ৭টা বা ৯টায় খেয়ে নিতে হবে। এ নিয়ে কোনো টেনশন ছিল না যে আজ কী বার, কত তারিখ। নিজেদের মধ্যে কত কথা তখন হত। পরস্পর এত কাছাকাছি আর কখনো আসা হয়নি, যা এই সাতদিনে হয়েছিল।

কোম্পানি আর সরকারের বাস্তবতা এই সাতদিনের জন্য পিছনে চলে গিয়েছিল। কায়েম হয়েছিল শ্রমিকদের অবাস্তবতা! ১৯ অক্টোবর ২০১১ তৃতীয় চুক্তি হল। ঠিকেদারের অধীনস্থ সমস্ত শ্রমিককে কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হল। স্থির হল, আগের ৪৫ সেকেন্ডে একটি গাড়ি তৈরির (অ্যাসেম্বলি করা) বদলে এখন ১ মিনিটে হবে।

কোম্পানি প্রচলিত বাস্তবতার নতুন ঘেরাটোপ তৈরিতে লেগে গেল। অক্টোবরের দিনগুলোতে সুজুকি পাওয়ারট্রেন কারখানার তিনজন শ্রমিক মারুতি-সুজুকির শ্রমিকদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির কাজে বিশেষ আগুয়ান ভূমিকা নিয়েছিলেন। যেহেতু এই তিনজন একটা দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলেন এবং ১৯ অক্টোবর চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন, তাই এদের বাদ দিয়ে ২১ অক্টোবর চুক্তি সেরে নেওয়া হল। যারা তাতে স্বাক্ষর করল, তাদের কর্তৃত্ব রাখতে তিনবছরের চুক্তি করা হল এবং প্রতিবাদী তিনজনকে সাসপেন্ড করা হল। কোম্পানি নিজেদের নিয়ন্ত্রণ মজবুত করার জন্য পরের বছর অর্থাৎ ২০১২ সালের ১৭ এপ্রিল ওই তিনজনকে বরখাস্ত করল। চুক্তিকারী ম্যানেজমেন্ট এবং শ্রমিকনেতারা শিল্পে শান্তি বজায় রাখলেন। সুজুকি পাওয়ারট্রেন আর মারুতি-সুজুকির সাহেবরা দুই কোম্পানিকে সংযুক্ত করে মিলিতভাবে বিদ্রোহী শ্রমিকদের চিহ্নিত করল। সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হল বি-প্ল্যান্ট। নতুন ইউনিয়নকে রেজিস্ট্রেশন দিল সরকার। ম্যানেজমেন্টও এই ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিল। ফলস্বরূপ, স্থায়ী শ্রমিক এবং অন্য শ্রমিকদের আলাদা করে ফেলার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে ফেলা হল। অথচ গতবছর এগারোটা কারখানা দখলের সময় ঠিকা শ্রমিকদের কাজের দাবিতে স্থায়ী, ঠিকা, ট্রেনি আর অ্যাপ্রেন্টিসরা সকলে একত্রিত হয়েছিল, বাস্তবে যা ছিল নজিরবিহীন।

এরকম এক পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরালো হতে থাকল। শ্রমিকরা বিদ্রোহের দিনগুলোতে আদায় করে নেওয়া সম্মান হারাতে থাকল। আবার শুরু হল গালিগালাজ, ইউনিয়নকে শ্রমিকদের কাছে অপদস্থ করা। শ্রমিকদের সংগঠিতভাবে প্ররোচিত করা এবং শ্রমিকদের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটলে তাকে দমন করার ব্যবস্থাও ফের কায়েম করল কোম্পানি।

শ্রমিকদের মধ্যে ফের পুরোনো স্থিতাবস্থা ফিরে এল। এখন তাদের কাছে স্থিতাবস্থার দুই প্রতীক — কারখানা ও ম্যানেজমেন্ট — টার্গেট হল। এইরকম পরিস্থিতিতেই ঘটে গেল ১৮ জুলাই ২০১২-র ঘটনা। শ্রমিকদের হাতে নিগৃহীত হল ম্যানেজারেরা, একজনকে পুড়িয়ে মারা হল। ***চলবে***

উৎসবের সময় তিনি নিজে কখনো নতুন জামাকাপড় পরতেন না

জিতেন নন্দী, রবীন্দ্রনগর, মহেশতলা, ২৭ অক্টোবর •

দল বলতে আমরা অভ্যাসবশে তাকাই 'নেতা' অথবা তার 'মহান শিক্ষক'দের দিকে। নেতাদের বাহাদুরিতে চমৎকৃত হই কিংবা তাদের গদ্দারিতে ক্ষুব্ধ হই। কিন্তু প্রতিটি দলের মধ্যেই অগণিতদের ভিড়ে থাকে এমন সব মানুষ, যাদের কাছ থেকে জীবনের পথে চলার কিছু শিখে নেওয়া যায়। এমনই একজন মানুষ প্রয়াত পীযূষ কান্তি সরকার। তাঁর বার্ষিক স্মরণসভা হল তাঁরই বাড়িতে আজ ২৭ অক্টোবর।

গতবছর কালীপুজোর পরদিন পীযূষ কান্তি সরকার শব্দবাজির প্রকোপে অসুস্থ হয়ে অভিযোগ জানাতে থানায় গিয়েছিলেন। থানার কর্তব্যরত কর্মচারীদের কোনো সাড়া না পেয়ে বাড়ি ফেরার পথে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। তাঁর এই অকালমৃত্যুতে স্বতস্ফূর্ত প্রতিবাদ করে স্থানীয় মানুষ। আবার আসতে চলেছে কালীপুজো। তাঁর মৃত্যুর একবছর পর তাঁর পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশী-বন্ধুরা আজ মিলিত হয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে।

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী বলেন, 'তিনি সহজ সরল জীবনযাপন পছন্দ করতেন। এই উৎসবের সময় (দুর্গাপূজা) তিনি নিজে কখনো নতুন জামাকাপড় পরতেন না। তিনি বলতেন, অনেক মানুষ আছে যাদের নতুন জামাকাপড় জোটে না। সবসময় অন্যদের কথাটা ভাবতেন। উৎসব বলতে তাঁর মনে পড়ে যেত ছোটোবেলার গ্রাম রাজশাহীর নওগাঁর উৎসবের কথা। উনি চাইতেন, তাঁর মৃত্যু যেন তাঁর জন্মভূমিতেই হয়। কিন্তু সেটা সম্ভব ছিল না। উনি আমাকে সবসময় বলতেন, জীবনে কী পাওনি আর কী পেয়েছো হিসেব মেলাতে যেও না। সমাজের দিকে তাকিও ...'

ওঁদের বড়ো ছেলে পল্লব বলেন, 'বাবা বলতেন, ভিতর থেকে ভালো হওয়ার চেষ্টা কোরো।'।

ছোটো ছেলে প্রবুদ্ধ বলেন, 'বাবা আমাদের কখনো উপদেশ দিয়ে বা শাসন করে কিছু শেখাতেন না। তিনি তাঁর আচরণের মধ্যে দিয়ে আমাদের শিখিয়ে দিতেন। বাবা কথায় আর কাজে এক ছিলেন।'

তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু বর্ষীয়ান অনিল তপাদার বলেন, 'বামপন্থীদের মধ্যে কথা আর কাজের অমিল তাঁকে দুঃখ দিত। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইউনিয়নের আলোচনায় গিয়ে নেতাদের দ্বিচারিতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না।' অথচ নিজে ছিলেন একজন শ্রমিক। মেটিয়াব্রুজ-তারাতলা অঞ্চলের বিখ্যাত কারখানা জিইসি-তে তিনি ছিলেন বামপন্থী ইউনিয়নের সক্রিয় সদস্য।

প্রতিবেশীরা তাঁকে সকলেই প্রতিবাদী হিসেবে চিনতেন। অনেকেই স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, এই জায়গাটা ছিল একটা ধানজলা। এটাকে বাসযোগ্য করার জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। বরাবর পাড়ায় সকলের খোঁজখবর নিতেন। উচ্চস্বরে কথা বলতেন না। কিন্তু হাসতেন হো হো করে উচ্চস্বরে। এরকম প্রতিবেশী আর পাওয়া যাবে না।

Postal Regn No. KOL RMS/424/2011-2013
Regn no. RNI No. WBBEN/2009/33712

তুঁয়ার মতন আমার বিটা ছিলে — দু–দুটা ... বেঁচে থাক! বেঁচে থাক ...

বলে আমার হাতটা এমন করে চেপে ধরলেন বৃদ্ধা, চোখ ঘোলাটে, চলতে পারেন না ঠিক মতো, কোনোমতে লাঠি ভর দিয়ে হাঁটছেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন জলের ধারার কাছে। পাহাড়ি এক ক্ষীণ জলের ধারা, এক জায়গায় পাথুরে মাটি ভেদ করে ভুরভুর করে জল বেরোচ্ছে, নাম তার ভুরভুরি —— সে দেব্‌তা আছে। হাতের লাঠি ফেলে দিয়ে নুইয়ে পড়ে বৃদ্ধা অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করে জলে নামলেন। বারবার অঞ্জলি ভরে জল তুলছেন আর বিড়বিড় করে কথা বলছেন। আর জলের ধারাতেই উৎসর্গ করছেন। এরপর জল থেকে উঠে লাঠিটা খোঁজার চেষ্টা করতে লাঠিটা এগিয়ে ধরতেই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলে উঠলেন —— তুঁয়ার মতন আমার বিটা ছিলে —— দু–দুটা ... বেঁচে থাক! বেঁচে থাক ...

আমার সংসারে সবই আছে। ওধারকে থাকি বটেক। কথা বলতে বলতে শক্ত করে আমার হাতটা চেপে ধরলেন। আমার মুখ ফুটে একবার বেরিয়েছিল, কী হয়েছিল আপনার ছেলেদের? বৃদ্ধার ভুরভুর করে বেরিয়ে আসা কথা আর চোখের জলে আমার সমস্ত সন্ধানী প্রশ্ন ভেসে গেল ... কেবল কানে বাজতে থাকল, বেঁচে থাক, বেঁচে থাক। আমি চুপ করে অনেকক্ষণ তাঁর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

এধারে ভুরভুরি নিয়ে শহুরে সুরজিতের অনুসন্ধান কার্য চলছে –— চলছে ভুরভুরিতে কাঠি দেওয়া। সুরজিৎ বলে ওঠে, ভুরভুরিতে নামতে পারবি? অপরদিক থেকে হারুন উত্তর করে, 'এত মানুষ যাকে দেবতা বলে বিশ্বাস করে, দ্যাখ পাথরের ধারে ধূপ দিয়ে পূজা দিচ্ছে, তাতে আমি পা দিতে যাব কেন? পাকামি করার কী আছে! ...' আমাদের তর্কটা সরে যায় একটা জলাশয় ঘেরা লাল শালুকের সৌন্দর্য্যের মাঝে। গুটিগুটি পায়ে আমরা কয়েকজন অযোধ্যা পাহাড় সংলগ্ন খেতখামার পার করে এক বটতলার ছায়ায় দাঁড়াই। সামনে মাটির দেওয়াল, সেই সকাল থেকে লেপে যাচ্ছে মেয়েরা। বেলা প্রায় দশটা। দূর থেকে লাল মাটি জোগাড় করে মাথায় করে বয়ে এনে দেওয়াল লেপার কাজ করে। এরপর সেই দেওয়ালে ছবি আঁকা হবে।

শহুরে ট্যুরিস্টের আনাগোনা শুরু হয়েছে অযোধ্যা পাহাড়ে। দু–একটি খাবার হোটেলে দারুণ ভিড়। চকচকে চামড়ার ট্যুরিস্টরা এতদিন ট্যুরিস্ট না আসাতে এই আদিবাসীদের কী অবস্থা ছিল তাই নিয়ে কটকটে বিশ্লেষণে ব্যস্ত। হোটেলের প্রাণবন্ত কিশোর ছেলেটি হাসিমুখে ওদের চা দিয়ে যায়। হঠাৎ দুটি বলদের শিঙে শিঙ ঠেকিয়ে লড়াই দেখে ট্যুরিস্টরা উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে। মোবাইল ক্যামেরা ঝকমকিয়ে ওঠে। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে ছেলেটি। ধিঙ্গি মেয়ে প্রশ্ন করে, 'মাম্মি মাম্মি গরুর মেল ফিমেল হয়!' মাম্মি বলতে শুরু করেন, 'গরুর রিপ্রোডাকশন হবে কী করে! গরুর ফেমিনিন জেন্ডার হল গরু। আর মেল হল ষাঁড়। ওদের মেল ফিমেল থেকে রিপ্রোডাকশন হয়, বুঝলি না'। হোটেলের কিশোর ছেলেটি ফ্যালফ্যাল করে ওদের দিকে চেয়ে থাকে, হাতে খাবারের থালাটা।

মালিক ভাড়া নিয়ে বসে আছে, ড্রাইভার ছোট্টু সেই সকালে পেশেন্ট নিয়ে শিকরাবাদ গেছে। ফিরে আসতেই মালিক তাকে বেরোতে বলছে ট্যুরিস্ট নিয়ে। সকাল থেকে তার খাওয়া হয়নি। প্লাস্টিকে কিছু মুড়ি নিয়ে ছোট্টু আমাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সে গাড়ি চালাতে শিখেছে ছেলেবেলায়। তার বাবা মা মারা গেছে ছেলেবেলাতেই। সে সব কাজই করতে পারে। সে কিছু চাষ আবাদও করে। এখানে চাষ করা খুব কঠিন —— একবার ফসল হয়। এক টুকরো জমি তৈরি করতে পাঁচ সাল লেগে যায়। পাহাড়ের ওপর থেকে জমি দেখে যে চোখ জুড়িয়ে যায়। সে জানায়, গণ্ডগোলের সময় যখন ট্যুরিস্ট আসত না, তখনও গাড়ির ভাড়া ছিল। কারণ, এই অযোধ্যা পাহাড় এলাকা বিরাট। সেই তুলনায় গাড়ির সংখ্যা খুবই কম। পাহাড়ের ভাঙাচোরা এবরো খেবরো পাথর বিছানো পথে গাড়ি চালাতে চালাতে ছোট্টু গর্বভরে বলে আপনাদের কলকাতার ড্রাইভাররা এই রাস্তায় গাড়ি চালাতে পারবেক লাই। টাকাপয়সা বেশি মিলবে, সে কি কলকাতায় যাবে? জিজ্ঞেস করায় ছোট্টু সাফ জানায়, ইখান ছেড়ে যাবক লাই। পরিবার ছেড়ে যাবক লাই। বাচ্চা আছে।

ক্রমশ

পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে ২৬–২৭–২৮ অক্টোবর ঘুরে এসে বঙ্কিম, পরের সংখ্যায় বাকি অংশ

ইছামতীর ধারে টাকীতে (শেষাংশ)

অমিতাভ সেন, কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর •

পথে দেখেছি প্রায় ১০০ বছরের পুরোনো নন্দদুলালের মন্দির। মন্দিরের সামনে খোলা মাঠের ঘাসে নীল তারার মতো ছোটো ফুল, বিরাট পুকুরের ওপর উড়ে যাওয়া বক। গোলপাতার জঙ্গল বা মিনি–সুন্দরবন আমাদের মূল গন্তব্য, সেটা বাংলাদেশ সীমান্তের ধারে। ইটপাতা পথ সেখানে সিমেন্টে বাঁধাই হয়ে শ্বাসমূলওয়ালা গাছের জঙ্গল বেয়ে চলে গেছে এক বাঁধানো চত্বরে। উঁচু সেই পাকা পথের নিচে ইছামতীর মরা সোঁতায় জল নেই। থকথকে কাদায় চিতি কাঁকড়া আর অল্প জলে গুলে মাছ দেখা যায় নিচে। এতক্ষণ যে বসত এলাকার মধ্যে দিয়ে এলাম তা এখানে এসে শেষ হয়েছে। গোয়ালের ধারে রাংচিতা বা কুয়োর পাড়ে কালকাসুন্দির ঝোপের কাঁচা সবুজ এখানে এসে নোনা গাছের কালচে সবুজে পরিণত হয়েছে। জায়গাটা বেশ নির্জন —— তবে মিনি–সুন্দরবন নামটা বোধহয় টুরিস্টদের আকর্ষণ করতেই। যারা সুন্দরবন দেখেছে তাদের অমনটাই মনে হবে।

এই যা দেখার। তাছাড়াও দেখলাম ওখানকার মানুষজন। বিকেলের টিফিন কিনতে গিয়ে দেখলাম দোকানে লেখা আছে 'ইছামতী লস্যি খান এখানে পাওয়া যায়'। সে দোকান তখন বন্ধ ছিল। উল্টোদিকের দোকানে সিঙ্গাড়া কেনার সময় একজন খদ্দেরের সঙ্গে দোকানির কথোপকথন শোনা গেল। এসইউসি–র প্রচারক তখন সাইকেল রিকশায় চড়ে মাইকে 'মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর বন্ধ সফল করুন' বলতে বলতে চলেছে। খদ্দেরটি গজগজ করছিল, 'কী হবে বন্ধ করে, জিনিসের দাম কমবে? দুগুণা, চারগুণা করে রোজ বেড়ে চলেছে।' চেহারাটা তার খেটে খাওয়া মানুষের মতো। দোকানদার তাকে খুচরো ফেরত দিতে দিতেই বলল, 'একটা প্রোটেস্ট তো হবে।' খদ্দের অসম্মতির মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেল।

পরের দিন সকালে আলাপ হল পুরসভার নির্মিত সুলভ–কমপ্লেক্সের শৌচাগারে যে ছেলেটা বসে তার সঙ্গে। একটাকা দিয়ে বাথরুম সেরে ফেরার সময় কথা হল। নাম বলল নিত্যানন্দ মণ্ডল। আঙ্গুল তুলে বাড়ি দেখালো একটু দূরে। বাইশ–চব্বিশ বছরের ছোকরা। সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা অবধি ডিউটি দেয় ওখানে। মধ্যে আধঘন্টা স্নান–খাওয়ার ছুটি। মাইনে কিছু নির্দিষ্ট করা নেই। শৌচাগার ব্যবহারকারীরা যে পয়সা দেয় সেটাই তার মাইনে। অফ সিজনে ৪০–৬০ টাকা হয়। সিজনে ২০০–২৫০ টাকা। বাথরুম পরিষ্কার করার দায়িত্ব নিজের খরচায়। তাতে কিন্তু ছেলেটার হাসির কমতি নেই। কথা বলতে বলতে সে মাঝে মাঝে হাসছিল।

আর আলাপ হল তিলক দাস ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। ওঁরা দুজনে দোকান চালান নদীর ধারে। 'তোমার হিংসা আমার জয় ভ্যারাইটি স্টোর্স' ওঁদের দোকানের নাম। ওখান থেকেই পান–সিগারেট–চা–সাবান কিনতাম আমরা। ফেরার দিন দুপুরের খাওয়া ওখানেই খেলাম। ডাল–ভাত–আলুর চোখা– কচি পটল দিয়ে জ্যান্ত পোনার ঝোল। সত্যি কী অপূর্ব খেতে! ৪০ টাকার এই ডিশ গেস্ট হাউসের ১২০–১৪০ টাকার দামি মাছের ডিশকে হারিয়ে দিল শুধু রান্নার গুণে। মুগ–মুসুরি মেশানো ডাল আমরা ভাতে মেখে খেলাম, চুমুক দিয়ে খেলাম, তবু রয়ে গেল। ভাতটা একটু মোটা চালের হলেও স্বাদটা বেশ মিষ্টি, তাও সব খেতে পারলাম না।

এমন সময় লাদেন এল। দেবদাস ওর জন্য অপেক্ষা করছিল আর দোকানের কাজে তিলকদা ও বৌদিকে সাহায্য করছিল। ওরা আজ আমাদের স্টেশনে নিয়ে যাবে আগেই বলে রেখেছিল। আমরা ফিরে যাচ্ছি কলকাতা। কানে এল দোকানদার–বৌদি বলছেন, এই লাদেন ভাতটা ডাল দিয়ে খেয়ে নে না। লাদেনেরও তখন খিদে পেয়েছে। সকালে সে ভ্যান নিয়ে স্টেশনে গিয়েছিল। সে হাত ধুয়ে ফেলল। তিলকদা বললেন, ওইটুকু ভাতে ওর খাওয়া হবে নাকি? দেবদাস বলল, আকাশের মেঘ দেখছিস, চেপে বৃষ্টি নামবে, আগে বাবুদের ছেড়ে দিয়ে আসি চল, ফিরে এসে খাস। বৌদি বলল, ঠিক আছে, তোর ভাত ঘরে রাখা থাকবে। ঘাড় একদিকে কাত করে লাদেন ভ্যানচালকের সিটে গিয়ে বসল। দেবদাস তার সামনের ভ্যানের সিটে। আমরা ব্যাগ–ট্যাগ নিয়ে উঠতে উঠতে শুনলাম তিলকদা আর বৌদি বলছেন, 'আবার আসবেন। আমাদের দুটো থাকার ঘরও আছে। থাকতে পারেন। বিজয়া দশমীর দিন খুব ভিড় হয়। আগে থেকে খবর দিলে ঘর পাবেন। ওইদিন এলে খুব মজা হয়, ওপার–এপার করতে কোনো বাধা থাকে না।'

আমরা ভাবতে ভাবতে ফিরলাম, বাধা থাকলেই বা কী? রক্ষী দিয়ে সীমানা সত্যি কতটা বাঁধা যায়? তিলকদা–বৌদি–দেবদাস–লাদেন সবাইকে তো একই পরিবারের মনে হয়। তাছাড়া, ইছামতীর জল কি সত্যিই ভাগ করা যায়? ওপারের জল এপারের সাথে মিশে যাচ্ছে না? একা ভূগোলের বিভাজনকেই ঠেকানো যায় না তার সঙ্গে যদি তার দোসর হিসেবে ইতিহাস এসে জোটে? ভাবতে ভাবতে বৃষ্টি এল, শিল্প–সাহিত্যে বিচ্ছেদের দৃশ্যে যেমনটা হয়, ঠিক তেমনটা, এই যাওয়ার সময় সত্যি! ভিজে ঝুপ্পুস হয়ে স্টেশনে এসে ট্রেন ধরলাম ১২টা ৩–এর।

উৎসবের মধ্যে কিশোরের মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

মুহাম্মদ হেলালউদ্দিন, ধুবুলিয়া, ২৪ অক্টোবর •

কৃষ্ণনগর থেকে আট কিমি দূরে ধুবুলিয়া থানার আশাডাঙায় ১২ বছরের স্কুল ছাত্র রুহুল আমিন শেখের (পিতা সইদুল শেখ) মাথা ও দেহ আলাদা দেখে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ২১ অক্টোবর পুজো দেখতে বেরিয়েছিল রুহুল, রাত পেরিয়ে সকালে ফিরে না আসায় খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। রাত্রিতে নিখোঁজ ২২ অক্টোবর সকালবেলায় গলাকাটা দেহ উদ্ধার হয় আমবাগানে।

২৪ অক্টোবর এআইইউডিএফ–এর সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি, রবীন্দ্রনাথ দেবনাথ, পিপলস ফ্রন্ট ফর জাস্টিস–এর মতিয়ার রহমান প্রমুখ ঘটনাস্থলে যান। সঙ্গী ছিলেন এই প্রতিবেদক। রুহুলের দিদিমা জরুন বিবি ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠে বলেন, আমার নাতিকে বলি দেওয়া হয়েছে। এসপি বলেন, পারিবারিক বিবাদে রুহুল আমিন খুন হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ধুবুলিয়া থানার ওসি বলেন, রুহুল আমিন এমন কিছু দেখে ফেলেছিল, তাকে খুন হতে হয়েছে।

পরে প্রতিনিধিদলটি জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করে বিচারবিভাগীয় তদন্ত, দোষীদের গ্রেফতার, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানায়।

কিশোরকে পিটিয়ে হত্যা মুর্শিদাবাদে

বিজয়া দশমীর ভিড়ে ধাক্কাধাক্কির পর রেজিনগর থানার ধিকরা গ্রামের কিশোর শাহরুখ শেখ (১২)–কে নওদা থানার সরবঙ্গপুর গ্রামে পুজো কমিটির লোকজন নেতাজি সঙ্ঘ নামে একটি ক্লাবে ধরে নিয়ে গিয়ে বেদম মারধর করে। পুলিশ তাকে উদ্ধার করে বহরমপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। ওই রাত্রেই কিশোরটি মারা যায়। এতে নদিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার নওদা–রেজিনগর থানার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ১৪ জন গ্রেফতার হয়, র‍্যাফ নামানো হয়।

উৎসবের মরশুমে পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুই কিশোরের নৃশংস হত্যার তীব্র নিন্দা করেছে এআইইউডিএফ, জমিয়তে উলেমা হিন্দ, এসডিপিআই, পিপলস ফ্রন্ট ফর জাস্টিস প্রভৃতি সংগঠনগুলি।

খ ব রে দু নি য়া

ঘূর্ণিঝড় স্যান্ডির দাপটে লণ্ডভণ্ড ক্যারিবিয়ান, আমেরিকা

কুশল বসু, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর, তথ্যসূত্র উইকিপিডিয়া, হাফিংটন পোস্ট •

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে আটলান্টিকের মধ্যভাগ, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং উত্তর–পূর্ব আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভাসিয়ে নিয়ে গেল হারিকেন স্যান্ডি (একটি বিষুব অঞ্চলের সাইক্লোন)। অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে একটি বিষুব ঝড় হিসেবে শুরু হয়ে তারপর পক্ষকাল ধরে চলার পর ঝড়টি আটলান্টিক মহাসাগরের কাছে ক্যারিবিয়ান সাগরে গরম জলের সংস্পর্শে এসে ভয়ংকর সাইক্লোনের রূপ নেয় ২২ অক্টোবর।

২৪ অক্টোবর স্যান্ডি ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের জামাইকার রাজধানী কিংস্টনের ওপর আছড়ে পড়ে ১৩০ কিমি প্রতি ঘন্টা বেগে। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে সুন্দরবনে সাইক্লোন আয়লা আছড়ে পড়েছিল সর্বোচ্চ ১১০ কিমি প্রতি ঘন্টা বেগে। কিউবার ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় স্যান্ডি ঘূর্ণিঝড়টির বেগ ছিল ঘন্টায় ২১৬ কিমি। পরে এটি উত্তর আমেরিকার দোরগোড়ায় হাজির হয় কিছুটা দুর্বল হয়ে।

ঘূর্ণিঝড় স্যান্ডি জামাইকা, হাইতি, কিউবা, বাহামা, আমেরিকা এবং বাহামার বিস্তীর্ণ এলাকা বিধ্বস্ত করে দেয়। কিছু মানুষকে সব জায়গাতেই আগেই নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিপুল মানুষ গৃহহীন হয়, মারা যায় মোট ১২৩ জন, বন্ধ হয়ে যায় অনেক বিমানবন্দর, রেল–সড়ক–মেট্রো পথ। বিদ্যুৎ চলে যায় বিস্তীর্ণ এলাকায়।

এই ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়ের প্রেক্ষাপটে ফের বিশ্ব উষ্ণায়নের কথা চলে এসেছে। এবছর আটলান্টিকে এর মধ্যেই ১৯টি বড়ো ধরনের সাইক্লোন এসেছে, এখনও বছর শেষ হতে এক মাস বাকি। সাধারণত বছরে ১০–১২টির বেশি বড়ো সাইক্লোন আসে না। সমুদ্রের উপরিভাগের তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে সাইক্লোনের ভয়ঙ্করতা বেড়ে যায়, কারণ গরম সমুদ্র অনেক বেশি বাষ্প সেই সাইক্লোনে যুক্ত করে দেয়। আর এই সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে মানুষের হাত আছে। সমুদ্রের গভীর থেকে রাশি রাশি গর্ত খুঁড়ে তেল তোলার বন্দোবস্ত থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকল্পের (তাপবিদ্যুৎ বা পরমাণু বিদ্যুৎ, কেমিকাল, ধাতু প্রভৃতি) নির্গত গরম জল সমুদ্রে মিশে যাওয়া —— আমাদের তৈরি বিভিন্ন কারণেই সমুদ্রের তাপমাত্রা বাড়ছে। একইসাথে বাড়ছে সমুদ্রের জলতলও, বরফ গলে যাওয়ার ফলে।

এক নজরে

- *মৃত হাইতিতে ৫৪, আমেরিকায় ৫১, কিউবাতে ১১, বাহামায় ২, কানাডায় ২, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে ২, জামাইকাতে ১।*
- *গৃহহীন হাইতিতে ২ লক্ষ, কিউবাতে ৫৫ হাজারকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ১ লক্ষ ৩২ হাজার বাড়ির ক্ষতি হয়, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে ৩০ হাজার মানুষকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।*
- *আমেরিকায় তিনটি পরমাণু কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়, একটিতে (অয়সটার ক্রিক) চুল্লির খাঁচার মধ্যে সাড়ে ছয় ফুট জল উঠে যায়, সেখানে সতর্কতা জারি করা হয়।*
- *ক্ষতি আমেরিকার এক লক্ষ কোটি টাকা, আর কিউবা, বাহামা, কানাডা ও জামাইকার মিলিত ক্ষতির পরিমাণ দুই হাজার কোটি টাকার মতো। হাইতি এবং ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রের ক্ষতির পরিমাণ অজানা।*

মায়ানমারে ফের রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর হামলা, উচ্ছেদ

কুশল বসু, কলকাতা, ৩১ অক্টোবর •

অক্টোবর মাসের তৃতীয় এবং চতুর্থ সপ্তাহে ফের মায়ানমারে বাংলাভাষী রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর আক্রমণ শুরু হয়েছে। ২৭ অক্টোবর একটি মার্কিন মানবাধিকার এনজিও (হিউম্যান রাইটস ওয়াচ) কিছু উপগ্রহ ছবি দেখিয়ে দাবি করে, এই সময়ে মায়ানমারের পশ্চিম দিকে রাখিন রাজ্যে কিয়াউকপিউ জেলায় ৮০০ বাড়ি এবং হাউসবোট জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৯ অক্টোবরের উপগ্রহ ছবিতে যে সমস্ত বাড়িঘর দেখা যাচ্ছিল, ২৫ অক্টোবরের উপগ্রহ ছবিতে সেগুলির কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সমুদ্র তীরবর্তী এই এলাকার বেশিরভাগ মানুষই পালিয়ে গেছে বলে ওই এনজিওর দাবি। এই চিত্র প্রকাশের অব্যবহিত পরেই মায়ানমারের আধা–সামরিক সরকার জানায়, একশোর বেশি মানুষ মারা গেছে ওই আক্রমণে, পরে অবশ্য তারা জানায় সংখ্যাটা অনেক কম, ৬৫–র মতো। রোহিঙ্গাদের একটি সংগঠন (আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন) দাবি করে, মৃত প্রায় সাড়ে তিনশো এবং সাড়ে তিন হাজার ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে। তাদের আরও দাবি, রোহিঙ্গা মুসলিমদের গ্রামের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে রাখিন 'সন্ত্রাসবাদী'রা। মিলিটারি এদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র, যথা আগ্নেয়াস্ত্র, ছুরি, তীর ধনুক এবং নৌকার জ্বালানি আটক করছে, কিন্তু মানুষগুলোকে গ্রেফতার করছে না। রোহিঙ্গাদের সংগঠনটির আরও অভিযোগ, গ্রামীণ বৌদ্ধ মঠগুলো এই রাখিনদের আশ্রয় দিচ্ছে।

এদিকে কিয়াউকপিউ জেলায় সমুদ্র তীরবর্তী রোহিঙ্গা গ্রামগুলিতে আক্রমণ ধর্মীয় বা জাতিগত, নাকি তার পেছনে 'শিল্প'–এর জন্য গরিব মানুষকে উচ্ছেদের প্রচেষ্টা রয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন জেগেছে। এই কিয়াউকপিউ জেলা, যা কিনা বঙ্গোপসাগরের একদম তীরে অবস্থিত, সেখান থেকে গ্যাস এবং জ্বালানি তেল তোলা হচ্ছে এবং চীনের বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে তা লম্বা লম্বা পাইপলাইন করে পাঠানোও হচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়ান কোম্পানি দাইয়ু ইন্টারন্যাশনাল এই কিয়াউকপিউতে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে, সমুদ্র থেকে গ্যাস তুলে চীনে পাঠানোর জন্য। এই দাইয়ু ইন্টারন্যাশনাল পস্কো কোম্পানির একটি শাখা। এই প্রকল্পে দাইয়ু ছাড়াও বিনিয়োগ করেছে ভারতীয় কিছু কোম্পানি এবং মায়ানমারের কিছু কোম্পানি। এই গ্যাস চীনে পাঠানোর জন্য মায়ানমারের মাঝ বরাবর দুটি পাইপলাইন বানানোতে এই কিয়াউকপিউ–তে বিনিয়োগ করেছে চাইনা ন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম কোম্পানি। বঙ্গোপসাগর জুড়ে আরও কিছু গ্যাস উত্তোলন কেন্দ্র তৈরি করার জন্য অস্ট্রেলিয়ান কোম্পানি উডসাইড দাইয়ু–র সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। সু চি–কে মুক্তি দেওয়ার পর এবং মায়ানমারে নির্বাচনটি হওয়ার পর আমেরিকা ইউরোপের বিভিন্ন তালেবর দেশের জারি করা মায়ানমারারে ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ উঠতে চলেছে। সেই তালে কোরিয়ান, চীনা এবং ভারতীয় কোম্পানিগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মায়ানমার জুড়ে তেল গ্যাসের ব্যবসা শুরু করতে মরিয়া পশ্চিমি দুনিয়াও।

খবরের কাগজ সংবাদমন্থন
মঙ্গলবার দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যে ৭টার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের কেন্দ্র
বাকচর্চা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট,
কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১
সংবাদ, চিঠি, টাকা, মানি অর্ডার, গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা
জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ০৩৩–২৪৯১৩৬৬৬, ই–মেল : manthansamayiki@gmail.com
বছরে ২৪টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা ৪০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়।

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট অফিস বড়তলা, কলকাতা ১৮ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।
Printer, Publisher and Owner Jiten Nandi. Printed at Printing Art, 32A Patuatola Lane, Kolkata-9. Published at B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18. Editor-Jiten Nandi, B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18.